POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَآبِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ كَذٰلِكَ ؕ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ غَفُوْرٌ

এবং অনুরূপভবে মানুষ, জীবজন্তু এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও এমন আছে যাহাদের বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে কেবল জ্ঞানীগণই ভয় করে; নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, অতীব ক্ষমাশীল। (আল ফাতির, আয়াত: ২৯)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 8-9

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 19-26 Feb 2026 01-08 রমযান 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

মানুষের উচিত পুণ্যকর্ম করা এবং সেই সঙ্গে খোদাকেও ভয় করা

عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فِیْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُوْنَ (سورة المؤمنون:٦٢) يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ الَّذِیْ يَسْرِقُ وَيَزْنِیْ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ يَخَافُ اللّٰهَ قَالَ لَا يَا بِنْتَ اَبِیْ بَكْرٍ يَا بِنْتَ الصِّدِّيْقِ وَلٰكِنَّهُ الَّذِیْ يُصَلِّیْ وَيَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ

হযরত আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু 'আনহা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি মহানবী হযরত মহম্মদ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করলেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ 'এবং যারা যা দেয় তা দেয়, আর তাদের অন্তর থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত' (সূরা আল-মু'মিনূন: ৬২)-এর অর্থ কি এই যে, যে ব্যক্তি চুরি করে, ব্যভিচার করে এবং মদ্যপান করে, তবুও আল্লাহকে ভয় করে?

তিনি উত্তরে বললেন:

"হে আবু বকর-এর কন্যা! হে সিদ্দীকের কন্যা! এর অর্থ তা নয়। বরং এর অর্থ হলো-যে ব্যক্তি নামাজ আদায় করে, রোজা রাখে এবং সদকা প্রদান করে, তবুও সে আল্লাহ তা'আলা, যিনি পরাক্রমশালী ও মহান, তাঁকে ভয় করে।"

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল,৮ম খণ্ড, পৃ: ২৯৬-২৯৭)

****

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৯ আগস্ট ২০২৪
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১৬ আগস্ট ২০২৪
হুযুর আনোয়ার (আই.) এর অনলাইন সাক্ষাত ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নোত্তর।

তাকওয়া (ধর্মভীরুতা) এবং আল্লাহভীতি জ্ঞান থেকেই জন্ম লাভ করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেন:

"তাকওয়া (ধর্মভীরুতা) এবং আল্লাহভীতি জ্ঞান থেকেই জন্ম লাভ করে। যেমন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন: اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا 'নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা জ্ঞানসম্পন্ন' (সূরা ফাতির: ২৯)। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে প্রকৃত জ্ঞান আল্লাহভীতি সৃষ্টি করে। আর আল্লাহ তাআলা জ্ঞানকে তাকওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন-অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকৃত ও পরিপূর্ণভাবে আলেম হবে, তার মধ্যে অবশ্যই আল্লাহভীতি সৃষ্টি হবে।"

তিনি আরও বলেন: "আমার মতে এখানে 'জ্ঞান' বলতে কুরআনের জ্ঞানকে বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান বা অন্যান্য প্রচলিত বিদ্যা বোঝানো হয়নি। কারণ এসব বিদ্যা অর্জনের জন্য তাকওয়া ও পুণ্যকর্মের শর্ত নেই। যেমন একজন পাপিষ্ঠ ও অসৎ ব্যক্তিও এসব শিখতে পারে, তেমনি একজন ধার্মিক ব্যক্তিও শিখতে পারে। কিন্তু কুরআনের জ্ঞান তাকওয়াবান ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাউকে প্রদান করা হয় না। সুতরাং এখানে 'জ্ঞান' বলতে কুরআনের জ্ঞানই উদ্দেশ্য, যা থেকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি জন্ম নেয়।"

(মালফুজাত, খণ্ড ৪, পৃ. ৫৯৯, সংস্করণ ২০০৩, প্রকাশিত রাবওয়া)

পুনরায় হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস্ সালাম) বলেন:

"'উলামা' (আলেমগণ) শব্দ দ্বারা প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। প্রকৃত আলেম সে-ই, যে আল্লাহকে ভয় করে। اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا 'নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে তারাই তাঁকে ভয় করে যারা জ্ঞানসম্পন্ন' (সূরা ফাতির: ২৯)-অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা আল্লাহকে ভয় করে, তারাই প্রকৃতপক্ষে আলেম। তাদের মধ্যে পূর্ণ দাসত্ব ও আল্লাহ ভীতি এমন পর্যায়ে বিকশিত হয় যে তারা স্বয়ং আল্লাহ তাআলার নিকট থেকে এক বিশেষ জ্ঞান ও মারিফাত অর্জন করে এবং তাঁর থেকেই ফয়েজ লাভ করে। এই মর্যাদা ও মাকাম অর্জিত হয় রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ ও তাঁর প্রতি পূর্ণ ভালোবাসার মাধ্যমে-এমনকি মানুষ সম্পূর্ণরূপে তাঁরই রঙে রঞ্জিত হয়ে যায়।"

(মালফুজাত, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৩-৪৩৪, সংস্করণ ২০০৩, প্রকাশিত রাবওয়া)

যখন তারা এতিমদের সঙ্গে সদাচরণ করবে, দরিদ্রদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে তখন তারা অন্য সকলের তুলনায় মানুষের দৃষ্টিতে অধিক সুন্দর ও প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত হবে

وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ

হযরত মুসলেহ-মও'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) - সূরা রা'দের ২২ নম্বর আয়াতের ব্যাখ্যায় ("এবং যারা সংযুক্ত রাখে যা সংযুক্ত রাখার জন্য আল্লাহ আদেশ করেছেন, আর তারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে এবং কঠিন হিসাবকে আশঙ্কা করে) বলেন:

'খাশিয়াত' শব্দের মধ্যে সেই সত্তার পরিচয় ও জ্ঞান লাভের অর্থও নিহিত রয়েছে, যাঁকে ভয় করা হয়। অর্থাৎ 'খাশিয়াত' শব্দ তখনই প্রয়োগ করা হয়, যখন ভীত ব্যক্তি সেই সত্তা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করে। তদুপরি, এই ভয় কোনো ক্ষতি বা লোকসানের আশঙ্কা থেকে উদ্ভূত নয়; বরং এ কারণে জন্ম নেয় যে মানুষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, যাঁকে সে ভয় করছে তিনি অতি মহান ও মহিমাময়। সে আশঙ্কা করে, যেন নিজের কোনো গাফিলতির কারণে তাঁর নৈকট্য হারিয়ে না ফেলে।

অতএব, আল্লাহর 'খাশিয়াত'-এর অর্থ হলো-যখন মানুষ আল্লাহর সাথে সম্পর্কের (তাল্লুক বিল্লাহ) মর্যাদা অর্জন করে এবং তার নিকট স্পষ্ট হয়ে যায় যে এটিই মানবের প্রকৃত শান্তি ও পরিপূর্ণতার একমাত্র উৎস, তখন সে এই অবস্থান হারানোর চিন্তাও সহ্য করতে পারে না। সে সর্বদা তা আগলে রাখার চেষ্টা করে এবং সম্পূর্ণ সতর্ক থাকে, যেন কোনো অসাবধানতার কারণে অর্জিত নৈকট্য হারিয়ে না যায়।

এই নিদর্শনের দ্বিতীয় অংশ বর্ণিত হয়েছে: "এবং তারা মন্দ হিসাবকে ভয় করে" (وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ)। অর্থাৎ একদিকে সে আল্লাহর নৈকট্য রক্ষার ব্যাপারে গভীরভাবে সচেতন থাকে; অন্যদিকে সে এ বিষয়েও শঙ্কিত থাকে যে, আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনে কোনো ত্রুটির কারণে যেন আল্লাহ তাআলার বিরাগভাজন না হয়ে যায়।

প্রথম দুই বৈশিষ্ট্যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ককে মূল এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতিকে তার ফলাফল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই তৃতীয় প্রমাণে সে অনুযায়ী পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে: আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ঘাটতির ক্ষেত্রে 'খাশিয়াত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, আর সৃষ্টির সাথে সম্পর্কের ঘাটতির ক্ষেত্রে 'খাওফ' (ভয়) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম শব্দটি ইঙ্গিত করে যে যাকে ভয় করা হচ্ছে তিনি নিজেই উদ্দেশ্য ও কাম্য; আর 'খাওফ' শব্দটি অপরিহার্যভাবে এমন কিছুর জন্য ব্যবহৃত হয় না যা নিজেই চূড়ান্ত লক্ষ্য-বরং প্রায়ই তা এমন কিছুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যেখান থেকে দূরে সরে যাওয়াই উদ্দেশ্য। যদিও কখনো কখনো তা সেই সত্তার অসন্তোষের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়, যিনি নিজেই ভালোবাসা ও অনুরাগের চূড়ান্ত কেন্দ্র।

(তাফসিরে কাবীর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৫৪, সূরা রা'দ, আয়াত ২২-এর ব্যাখ্যা),

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

জুমআর খুতবা

“আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে কৃপণতা ও ঈমান একই অন্তরে একত্র হতে পারে না। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, সে তার সম্পদকে শুধু সেইটুকুই মনে করে না যা তার সিন্দুকে আবদ্ধ আছে; বরং সে আল্লাহর সমস্ত ভাণ্ডারকেই নিজের ভাণ্ডার মনে করে। ফলে কৃপণতা তার অন্তর থেকে এমনভাবে দুর হয়ে যায়, যেমন আলো উপস্থিত হলে অন্ধকার দুর হয়ে যায়।”

আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন যে প্রকৃত কোরবানি হলো–যা তোমরা ভালোবাস, তা তাঁর পথে ব্যয় করা। তবেই তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে এবং তাঁর অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হতে সক্ষম হবে।

আল্লাহর অনুগ্রহে জামাআতের অধিকাংশ সদস্য অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আর্থিক কোরবানিতে অংশগ্রহণ করে। তবে কিছু লোক আছে যাদের মধ্যে সংকোচ ও দ্বিধা দেখা যায়। তাদের মনে রাখা উচিত যে আল্লাহর পথে ব্যয় করা অপরিহার্য।

জাতির প্রতি সহমর্মিতা এবং মানবতার প্রতি দায়বদ্ধতা–উভয় দিক থেকেই আমাদের উচিত আল্লাহর পথে ব্যয় করা, যাতে তা মানুষের সাহায্যে এবং ইসলামের প্রচারের কাজে ব্যবহৃত হয়।

আমি লক্ষ্য করেছি যে অনেক সময় দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত উপার্জনকারীরাই সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করেন। কারণ তাদের এই উপলব্ধি আছে যে আল্লাহ তা'আলা তাদের এই সম্পদ ফিরিয়ে দেবেন অথবা তারা তাঁর অনুগ্রহের উত্তরাধিকারী হবেন।

আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে এটিও দেখেছি যে আল্লাহ তা'আলা কীভাবে মানুষকে অবিরত অনুগ্রহে ভূষিত করেন, কারণ তারা বিশ্বাস করে যে সমস্ত ভাণ্ডার একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

আল্লাহর অনুগ্রহে ওয়াকফে-জাদীদ প্রকল্পের ৬৮তম বছরে বিশ্বব্যাপী জামাআতের সদস্যরা প্রায় পনেরো মিলিয়ন পাউন্ড আর্থিক কোরবানি পেশ করার তৌফিক লাভ করেছেন। যা গত বছরের তুলনায় ১.৩ মিলিয়ন পাউন্ড বেশি।

আল্লাহ তা'আলা সকল কোরবানি দানকারীর সম্পদ ও জীবনে অগণিত বরকত দান করুন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ৯ জানুয়ারী, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (৯ সুলাহ, ১৪০৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۵ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ - (آل عمران:93)

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)সূরা আলে ইমরানের ৯৩ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন এবং বলেন–এই আয়াতের অনুবাদ: হলো– “তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত কখনোই প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ তোমরা সেই বস্তু থেকে (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় না করো যা তোমরা ভালোবাসো। আর তোমরা যা কিছুই ব্যয় করো না কেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা খুব ভালোভাবেই জানেন।”

এই আয়াতের তফসীরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) লিখেছেন, পবিত্র কুরআনের সূরা আল-বাকারা'র যেখানে প্রথম রুকু শুরু হয়েছে, সেখানে ‘মুত্তাকী' বা খোদাভীরুদের সম্পর্কে বলা হয়েছে, ***‘ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকুন'*** অর্থাৎ ‘আল্লাহ্ যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে (তারা) ব্যয় করে।' এটি প্রথম রুকুর বক্তব্য। এরপর এই সূরায় বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর পথে ব্যয় করার জোরালো তাকিদ দেওয়া হয়েছে। কাজেই, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ তোমরা নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় না করবে। তিনি (রা.) বলেন, আমার নিকট ***‘মিম্মা তুহিব্বুন'*** কথার অর্থ হলো ‘মাল' বা সম্পদ; কারণ আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ অর্থাৎ, ‘ধনসম্পদ মানুষের অত্যন্ত প্রিয়'। অতএব, প্রকৃত পুণ্য অর্জনের জন্য আবশ্যক হচ্ছে, নিজের ধনসম্পদ থেকে সর্বদা প্রিয় বস্তু (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় করতে থাকো। (হাকায়েকল ফুরকান, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০০)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও বিভিন্ন স্থানে এর তফসীর করেছেন। এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, “ধনসম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ – তোমরা কখনোই প্রকৃত পুণ্য অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেসব বস্তু থেকে আল্লাহ্র পথে ব্যয় না করবে যেগুলো তোমরা ভালোবাসো।”

আরেক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, “অকেজো ও তুচ্ছ বস্তু ব্যয় করে কোনো ব্যক্তি পুণ্যবান হওয়ার দাবি করতে পারে না। পুণ্যের দ্বার অত্যন্ত সংকীর্ণ। কাজেই এ বিষয়টি মস্তিষ্কে গেঁথে নাও যে, নিকৃষ্ট ও অকেজো জিনিস ব্যয় করে কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। কেননা সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ– যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের সবচেয়ে প্রিয় ও অত্যন্ত পছন্দের বস্তু ব্যয় না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত (আল্লাহ্র) প্রিয় হতে ও ভালোবাসার মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। যদি (তোমরা) কষ্ট স্বীকার করতে না চাও এবং প্রকৃত পুণ্য অবলম্বন করতে না চাও, তাহলে কীভাবে সফলকাম হতে ও অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে?” [তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ২য় খণ্ড, পৃ: ১৩০-১৩১]

অতএব, যারা কখনো কখনো ভালো আয়-রোজগার করেন কিন্তু আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সেই মান বজায় রাখেন না যা একজন সাধারণ বা মধ্যম আয়ের আহমদী বজায় রেখে থাকেন। এমন লোকদের চিন্তা করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, সত্যিকার কুরবানী হলো, যে জিনিসের প্রতি তোমাদের ভালোবাসা বা অনুরাগ রয়েছে তা তাঁর পথে ব্যয় করো; তবেই তোমরা আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হতে পারবে এবং তাঁর অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারী হতে পারবে।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের শুধু এক বা দুই স্থানেই নয়, বরং বহু স্থানে ‘ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ্' বা আল্লাহ্র পথে ব্যয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, এক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

وَ اَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

তিনি বলেন, “(তোমরা) আল্লাহ্র পথে ধনসম্পদ ও প্রাণ ব্যয় করো এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না। আর তোমরা অনুগ্রহ করো; নিশ্চয় আল্লাহ্ অনুগ্রহশীলদের ভালোবাসেন।” (সূরা আল-বাকারা: ১৯৬)

কাজেই, আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ না করা কখনো কখনো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়।

একদিকে এই দাবি করা যে, আমরা এ যুগের যুগ-ইমামকে মান্য করেছি এবং মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণকারী আর তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তভুক্ত, অপরদিকে কখনো কখনো আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে সংকোচ করা (মোটেও) সমীচীন নয়।

সমগ্রিকভাবে এ বিষয়ের (তথা আর্থিক কুরবানীর) প্রতি জামা'তের (সদস্যদের) গভীর মনোযোগ রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যাদেরকে অনেক স্বচ্ছলতা দান করেছেন, তাদের মাঝে কখনো কখনো এরূপ ধারণার উদয় হয়।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জামা'তের অধিকাংশ (সদস্য) আর্থিক কুরবানীতে সানন্দে অংশগ্রহণ করেন। কিন্তু যেমনটি আমি বলেছি, কেউ কেউ এমন আছেন যাদের মাঝে কুণ্ঠাবোধ কাজ করে। তাই তাদের আল্লাহ্ তা'লার এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত– আল্লাহ্র পথে আর্থিক কুরবানী করা অপরিহার্য।

অধিক উপার্জনকারীদের মধ্যে অবশ্যই এমন অনেকে আছেন যারা বিভিন্ন তাহরীকে অংশগ্রহণ করেন এবং গভীর আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করে থাকেন; কিন্তু এখানে আমি প্রসঙ্গক্রমে এটিও বলে দিচ্ছি, তারা তাদের সেসব চাঁদা, যেমন হিস্যায়ে আমদ ইত্যাদি নির্ধারিত হারে প্রদান করেন না এবং এক্ষেত্রে নিয়মিত নন। কাজেই এমন লোকদের আত্মপর্যালোচনা করা উচিত।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের অপর এক স্থানে বলেন,

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ اَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ -(الحديد:8)

অর্থাৎ, হে লোক সকল! (তোমরা) আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনো। আর পূর্ববর্তী জাতিদের পর (আল্লাহ্) তোমাদের যেসব সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়েছেন তা থেকে (আল্লাহ্র পথে) খরচ করো। আর তোমাদের মাঝে যারা মু'মিন

তারা আল্লাহ্‌র পথে খরচ করতে থাকে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। (সূরা আল-হাদীদ: ৮)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পথে ব্যয়কারীদেরকে মহাপুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

আর তোমাদের কী হয়েছে- তোমরা আল্লাহ্‌র পথে কেন খরচ করো না? অথচ আকাশসমূহ ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌রই'। (সূরা আল-হাদীদ: ১১)'

অর্থাৎ, এই নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের হাতে যা কিছু আছে পরিশেষে মানুষ তা রেখে মৃত্যুবরণ করবে আর তা (তথা সেই সম্পদ) আল্লাহ্‌রই করায়ত্তে চলে যাবে। মানুষের করায়ত্তে তো কিছুই থাকে না। অথবা উত্তরাধিকার বণ্টন হয়ে যায়, আর উত্তরাধিকারী সৎ না হলে তারা তা নষ্ট করে ফেলে; তার (তথা মৃত ব্যক্তির) হাতে কিছুই থাকে না, ইহলোকেও না কিংবা পরলোকেও না। তাই আগে থেকেই আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে চলা উচিত এবং তাঁর পথে ব্যয় করা উচিত, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এতে (তথা সম্পদে) বরকত দান করেন এবং পরবর্তী বংশধরদেরও হিফাযত করেন।

একইভাবে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের অপর এক স্থানে বলেন,

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'অতএব, (তোমরা) নিজ সাধ্যানুসারে আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করো। আর তোমরা তাঁর কথা শোনো, তাঁর আনুগত্য করো আর নিজের ধনসম্পদ তাঁর পথে খরচ করতে থাকো; এটি তোমাদের নিজেদের প্রাণের জন্যই উত্তম। আর যাদেরকে তাদের অন্তরের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়, তারাই সফলকাম।' (সূরা আত-তাগবুন: ১৭)

কাজেই আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, কার্পণ্য ও সংকীর্ণ তা সঠিক নয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হতে হলে তঁ ার পথে খরচ করতে হবে এবং পবিত্র কুরআনে এমন আয়াত অসংখ্য আয়াত রয়েছে যা আমাদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে, নিজেদের ধনসম্পদ থেকে আমাদের আল্লাহ্ তা'লার পথে খরচ করা উচিত। আর এ যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও যেমনটি বহুবার বলেছেন, ধর্মের প্রচার-প্রসার ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করতে, ইসলামের প্রচারের জন্য অর্থ-সম্পদের প্রয়োজন রয়েছে। এতে তোমাদের ব্যয় করা উচিত।

অতঃপর এটিও স্মরণ রাখা উচিত, যারা দ্বীনের জন্য অর্থ ব্যয় করে- যেমনটি আমি আয়াত পাঠ করে বলেছি- তার সুফল কেবল তারাই পায় না, বরং এর দ্বারা পুরো জাতি উপকৃত হয়। সুতরাং জাতির প্রতি সহমর্মিতা এবং মানবতার প্রতি সহমর্মিতারও দাবি হলো, আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করি; যেখান থেকে মানুষের সাহায্যের জন্যও ব্যয় হবে এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্যও ব্যয় হবে।

বিভিন্ন হাদীসেও রয়েছে, এই বিষয়ে মহানবী (সা.) বহু স্থানে নসীহত করেছেন যে, আর্থিক কুরবানী করা উচিত।

হযরত হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, এটি একটি হাদীসে কুদসী যেখানে মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার বরাত দিয়ে বলেছেন:

"হে আদম সন্তান! তুমি তোমার ধনভাণ্ডার আমার কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যাও। (এখানে) আগুন লাগারও ভয় নেই, কিংবা পানিতে ডুবে যাবার আশঙ্কাও নেই, বা কোনো চোরের চুরি করার ভয়ও নেই। আমার কাছে রাখা এই ধনভাণ্ডার আমি তোমাকে সেদিন পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়ে দেবো, যেদিন তোমার এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হবে।"(আল জামে লি শাবিল ঈমান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫)

সুতরাং এটি আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা যে, আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে আল্লাহ্ তা'লা সেই সম্পদ পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়ে দেবেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন:- وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ-

অর্থাৎ, "আর তোমরা উত্তম সম্পদের মধ্য থেকে যা কিছু তাঁর পথে ব্যয় করবে, তা তোমাদেরকে পূর্ণমাত্রায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে।"

(সূরা আল-বাকারা:২৭৩)

বরং অন্যত্র এটিও বলা হয়েছে যে, এর চেয়ে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং এটি হলো আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয়কারীদেরকে দান করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লার রীতি। যেমনটি আমি আগেও বলেছি, আমরা সৌভাগ্যবান যে, আজ আহমদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণির এই উপলব্ধি রয়েছে। তারা আল্লাহ্‌র পথে অকাতরে ব্যয় করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও এই ব্যয়ের এমন সব উদাহরণ বিদ্যমান। বরং সেগুলো দেখে তিনি (আ.) একবার বলেছিলেন, 'আমি বিস্মিত হই যে, এই লোকেরা যারা দরিদ্র- সেই দরিদ্র মানু ষেরা দ্বীনের খাতিরে এতটা কুরবানী করছে!' (সূত্র: মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৬৩)

আজও একই অবস্থা বিরাজমান। সাধারণ আহমদীদের যে সংখ্যা রয়েছে তারা এই বিষয়টি অনুধাবন করে যে, আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করতে হবে; তাদের এই বিষয়ে প্রখর উপলব্ধিও রয়েছে।

আমি দেখেছি যে, অধিকাংশ দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত আয়ের মানুষ অনেক বড়ো বড়ো কুরবানী করে থাকেন, কারণ তাদের মাঝে এই উপলব্ধি রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা এই সম্পদ আমাদের ফিরিয়ে দেবেন অথবা আমরা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারী হবো। সেটি কীভাবে? তা আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন- ইহকালেও এবং পরকালেও।

আসল কথা হলো, পরকালে আল্লাহ্ তা'লা এটি ফিরিয়ে দেবেন, এটিকে সওয়াবের বা পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং এই কুরবানীসমূহ তাদের জন্য মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ হবে।

অতঃপর একটি হাদীসে মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি পবিত্র উপার্জন থেকে একটি খেজুরও আল্লাহ্‌র পথে দান করে- আর আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না- তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেই খেজুরকে ডান হাতে গ্রহণ করবেন এবং তা বৃদ্ধি করতে থাকবেন যতক্ষণ না তা পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। তিনি (সা.) এখানে উদাহরণ দিয়েছেন যে, যেভাবে তোমাদের কেউ নিজের ছোটো বাছুরকে লালনপালন করে বড়ো করে, এমনকি একসময় তা একটি বিশাল পশুতে পরিণত হয়। (সহীহ বুখারী. কিতাবুয যাকাত, রেওয়ায়েত নম্বর-১৪১০)

সুতরাং যেভাবে ছোটো বাছুর লালিতপালিত হয়ে বড়ো হয়, অনুরূপভাবে তোমাদের সম্পদও বৃদ্ধি পেতে থাকবে যদি তোমরা আল্লাহ্‌র পথে দান করো। তবে শর্ত হলো, সম্পদ যেন পবিত্র হয়। এমন যেন না হয় যে, অন্যায় পথে উপার্জন করা হয়েছে বা সেই সম্পদ পুঞ্জীভূত করার জন্য অবৈধ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে তা চাঁদায় দেওয়া হলো; এমনটি হলে হবে না। বরং সম্পদ যখন পবিত্র হয়, তখনই কেবল আল্লাহ্ তা'লা তা কবুল করেন। অতঃপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেন,

কিয়ামতের দিন হিসাবনিকাশ শেষ হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পথে ব্যয়কারী ব্যক্তি নিজের ব্যয়কৃত সম্পদের ছায়াতলে থাকবে।

(মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৮৯৫)

সুতরাং কিয়ামতের দিনও এই আর্থিক কুরবানীগুলো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহকে আকর্ষণকারী হয়; শর্ত হলো, যদি তা পুণ্যের সংকল্পে ও পবিত্র সম্পদ থেকে করা হয়ে থাকে। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, জামা'তের সদস্যরা এই বিষয়টি অনুধাবন করে। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, যারা তাকওয়ার পথে চলে তাদের আর্থিক কুরবানী কবুল করা হয় এবং এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের অসংখ্য নেয়ামত দান করেন- জামা'তের অধিকাংশ লোক এর ওপর আমল করার চেষ্টা করে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের এক স্থানে বলেছেন:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র তাকওয়া অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তার জন্য (সংকট থেকে বের হবার) কোনো না কোনো পথ বের করে দেবেন। আর তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দেবেন যেখান থেকে রিযক পবার কল্পনাও সে করতে পারবে না। আর যে আল্লাহ্‌রওপর ভরসা করে, আল্লাহ্‌ই তার জন্য যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করেই ছাড়েন। আর আল্লাহ্ প্রত্যেক জিনিসের জন্য একটি পরিমাপ নির্ধারণ করে রেখেছেন। আর তাকে সে অনুযায়ী দান করেন।"

(সূরা আত-তালাক: ৩-৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন: "সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, আমরা তাকওয়া ও পবিত্রতায় কতটুকু উন্নতি করেছি তার মানদণ্ড হলো কুরআন। আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন এটিও রেখেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে জাগতিক অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত করে তার কর্মকাণ্ডের স্বয়ং তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান। যেমনটি তিনি বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে, আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক বিপদ-আপদে তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন। আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে কুরবানীকারী কেবল তারাই হতে পারে যারা আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে এবং আল্লাহ্ তা'লার জন্য কুরবানী করে। যখন তারা এমনটি করে, তখন তাদের এই চিন্তা থাকে না যে, আমাদের প্রয়োজন কীভাবে পূরণ হবে বা আমাদের খরচ কীভাবে মিটবে? আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য পথ তৈরি করে দিতে থাকেন।"তিনি (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তাদের জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দেন এবং তাদের জন্য এমন রিযকের ব্যবস্থা করেন যা তাদের জ্ঞান ও কল্পনায়ও থাকে না।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০-১১)

অতঃপর অপর এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন: "আল্লাহ্ তা'লা তাঁর খাতিরে কুরবানীকারীদের এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদেরকে বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখেন।"

তিনি বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা যাদের অভিভাবক হয়ে যান, তারা জগতের দুঃখকষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায়। তারা বিপদাপদ ও যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় এবং একটি প্রকৃত আরাম ও প্রশান্তিময় জীবনে প্রবেশ করে। তাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার ওয়াদা রয়েছে যে: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۝ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (সূরা আত-তালাক: ৩-৪) অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করে, তাকে আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় সকল প্রকার বিপদ ও কষ্ট উদ্ধার করেন, স্বয়ং তার রিযকের তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান, আর তিনি তাকে এমন উৎস থেকে দান করেন যা তার কল্পনাতেও আসতে পারে না।" (মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ২১৭)

অনুরূপভাবে তিনি অপর এক স্থানে এটিও বলেছেন যে, যারা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে এবং তাঁর প্রতি বিনত হয়, তারা কখনো ধ্বংস হয় না।

তিনি বলেন, "প্রকৃত রিযকদাতা হলেন আল্লাহ্ তা'লা। যে ব্যক্তি তাঁর ওপর ভরসা করে, সে কখনো রিযক থেকে বঞ্চিত হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা সবসময়, সব জায়গা থেকে তাঁর ওপর ভরসাকারী বান্দার জন্য রিযক পৌঁছে দেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যে ব্যক্তি আমার ওপর ভরসা করে ও পূর্ণ আস্থা রাখে, আমি তার জন্য আকাশ থেকে বর্ষণ করি এবং জমিনের নীচ থেকে উদ্গত করি। সুতরাং প্রত্যেকের আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা করা উচিত।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৪০-২৪১)

এভাবেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য উপদেশ দিয়েছেন এবং এই আয়াতের ব্যাখ্যাও করেছেন।

আল্লাহ্ তা'লার এটি এক বিশেষ অনুগ্রহ যে, জামা'তের সদস্যরাও এ বিষয়টি উপলব্ধি করে। তারা জামা'তের জন্য ত্যাগস্বীকার করে এবং আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করে। প্রতি বছর আমাদের সামনে সারা পৃথিবী থেকে অসংখ্য ঘটনা এসে থাকে। যেহেতু আমি এখানে ওয়াকফে জাদীদের প্রসঙ্গে কথা বলছি, তাই এমন কিছু মানুষের উদাহরণ তুলে ধরছি যারা ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা দিয়েছেন এবং আল্লাহ্ তা'লা তাদের ওপর বিশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ করেছেন, কিংবা আল্লাহ্‌র ওপর তাদের কতটা দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, তারা যদি ত্যাগস্বীকার করে, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যেমনটি আমি আগেও বলেছি, যারা মধ্যম আয়ের বা কম আয়ের মানুষ, তাদের মধ্যেই ত্যাগের মানসিকতা সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সাধারণত তাদের উদাহরণই আমাদের সামনে আসে।

ইন্দোনেশিয়ার একটি জামা'তের নাম পাঞ্জাঁর; সেই জামা'তের একজন ভদ্রমহিলা তাহেরা সাহেবা বলেন, আমি একজন খণ্ডকালীন শিক্ষিকা ছিলাম, বেতন খুবই কম ছিল। ওয়াকফে জাদীদের অর্থবছরের শেষ দিকে ন্যাশনাল সেক্রেটারির কাছ থেকে বার্তা পেলাম,আমার এক লাখ ত্রিশ হাজার রুপির ওয়াদা পরিশোধ এখনো বাকি রয়েছে। আমার কাছে শুধু এতটুকু অর্থই ছিল, যা আমি ছোটো একটি ব্যাবসা শুরু করার জন্য রেখে দিয়েছিলাম। সেই পরিমাণ টাকা আমার কাছে ছিল ঠিকই, কিন্তু নিজের জন্য তা রেখেছিলাম। তিনি বলেন, আমার মনে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো, কিন্তু পরে আমি আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করি এবং পুরোটা টাকাই ওয়াকফে জাদীদ খাতে দিয়ে দিই। এরপর আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে অনুগ্রহ করেন যে, অপ্রত্যাশিতভাবে স্কুল থেকে আমি একটি বোনাস পাই, যা তখন আমার খুবই প্রয়োজন ছিল। একইসাথে এ সুসংবাদও পেলাম যে, সরকারিভাবে আমাকে সাহায্যপ্রাপ্তদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তখনো আল্লাহ্ তা'লার যথাযথ কৃতজ্ঞতাও আদায় করতে পারি নি- এরই মধ্যে আরেকটি সুসংবাদ পেলাম যে, আমার শিক্ষক নিবন্ধন নম্বরও ইস্যু হয়ে গেছে- যেটির জন্য আমি বহু বছর ধরে অপেক্ষায় ছিলাম।তিনি বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পরিশোধ করায় গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই আল্লাহ্ তা'লার এই বিশেষ অনুগ্রহ আমার উপর বর্ষিত হয়েছে।

এরপর পূর্ব আফ্রি কার দেশ কেনিয়ার একটি ঘটনা। ইন্দোনেশিয়া ও কেনিয়ার মধ্যে হাজার হাজার মাইল দূরত্ব, কিন্তু চিন্তাধারা সেই একই রকম, আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের প্রতি একইভাবে অনুগ্রহ বর্ষণ করেন।

কেনিয়ার আমীর সাহেব একটি ঘটনা লিখেছেন, একজন মু য়াল্লিম সাহেব তার স্ত্রীর ঘটনা বর্ণনা করেছেন যিনি অত্যন্ত নিয়মিতভাবে চাঁদা প্রদান করেন। যদিও তার নির্দিষ্ট কোনো আয় নেই, তবুও চাঁদার ব্যাপারে তিনি খুবই সচেতন। এমন অবস্থায় বোঝা যায়- মানুষের প্রয়োজন কতটা তীব্র এবং সম্পদের প্রতি মায়া কত গভীর হতে পারে! সেই সময় আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয় করা আসলে নিজের হৃদয় কিংবা কলিজা বের করে দেওয়ার মতো- যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। তিনি লেখেন, এ বছর তার ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা ছিল চারশ শিলিং, যা তিনি পরিশোধ করেন। তিনি বলেন, আমার কাছে এটুকুই ছিল, এখন আমি একেবারে রিক্তহস্ত হয়ে গেলাম; যেটুকু ছিল তা পুরোটা দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কী অপূর্ব আচরণ করলেন! আল্লাহ্ বলেন, আমি এমনসব স্থান থেকে রিযক দেই, যেখান থেকে তোমরা কল্পনাও করতে পারো না। আল্লাহ্ তা'লা তাকে খালি হাতে ছেড়ে দেন নি। যখন তিনি বললেন, আমি রিক্তহস্ত হয়ে গেছি, তখন আল্লাহ্ তা'লা যেন বললেন, আমি তোমাকে খালি হাতে ছেড়ে দেবো না। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তার মেয়ের কাছ থেকে চৌদ্দশ শিলিং এই বিবরণের সাথে পেলেন যে, এ অর্থ থেকে আপনি চাঁদা দেবেন এবং বাকি টাকা দিয়ে নিজের প্র য়োজন মিটিয়ে নেবেন। পরবর্তীতে তার মেয়ের স্বামী ফোন করে। সেখানে এই রীতি রয়েছে যে, বিয়ের পর মেয়ের দেনমোহর তার পিতামাতা পেয়ে থাকেন। সে (অর্থাৎ তার জামা'তা) দেনমোহরের অর্থ বাবদ দুটি গরু তাকে পাঠিয়ে দেয়, যার মূল্য নব্বই হাজার শিলিং হয়। কেবল এখানেই শেষ নয়। তিনি বলেন, আমি তো চারশ শিলিং চাঁদা দিয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা অগণিত ও অসাধারণভাবে এমন স্থান থেকে এসব দান করেছেন যেখান থেকে পাওয়ার কোনো আশাই আমার ছিল না। এরপর তার আত্মীয়স্বজন এবং অন্যান্য ছেলেমেয়ের পক্ষ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে উপহার ও জীবনযাপনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ পেতে আরম্ভ করেন। এতে তিনি আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর এসব দেখে তার হৃদয়ে নিশ্চিত ধারণা জন্মায়- এসব কিছু চাঁদার কল্যাণেই বটে।

চাঁদা আদায় করলে একদিকে আল্লাহ্‌র আশিস বর্ষিত হয় আর অপরদিকে আল্লাহ্‌র আশিস অবতীর্ণ হতে দেখে মানুষের ঈমানও বৃদ্ধি পায়।

আফ্রিকার আরেকটি দেশ গিনি কোনাক্রি; সেখানকার মুবাল্লিগ কুন্ডিয়া অঞ্চলের একটি গ্রামের ঘটনা লেখেন, সেখানকার এক আহমদী ভদ্রমহিলা এ বছর এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার গিনি ফ্রাঙ্ক ওয়াদা করেছিলেন। শুনতে যদিও লক্ষ মনে হচ্ছে, কিন্তু বাস্তবে সেখানকার মুদ্রার মান নেই বললেই চলে, এজন্য এটি অনেক কম অর্থ। যাইহোক, তিনি বলেন, আমাদের স্থানীয় মুবাল্লিগ বছর শেষে যখন তার গ্রামে চাঁদা আদায়ের জন্য যান তখন সেই মহিলা সবজি বিক্রি করার জন্য বাজারে গিয়েছিলেন। সময় কম ছিল। তাই মুয়াল্লিম সাহেব সেই বাজারে চলে যান। তিনি তাকে বলেন, আপনি যে ওয়াদা লিখিয়েছিলেন তাতে আপনার এই বকেয়া আছে। ভদ্রমহিলা অত্যন্ত আক্ষেপের সাথে বলেন, এ মুহূর্তে আদায় করার জন্য তার কাছে কিছুই নেই। তিনি বলেন, আপনারা এখন চলে যান, আমি ইনশাআল্লাহ্ আদায় করে দেবো। দেখুন! এই মহিলা যিনি ঈমান এনেছেন এবং ইসলাম ও আহমদীয়াত গ্রহণ করেছেন, ঈমানে কত উন্নতি করেছেন! তিনি তাকে এ বলে এড়িয়ে যান নি যে, চলে যান, এখন আমি দিতে পারব না; বরং বলেন, এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছু নেই। আমি দ্রুত ব্যবস্থা করে আপনার কাছে পৌঁছে দেবো। যাহোক, আমাদের মুয়াল্লিম সাহেব সেখান থেকে চলে আসেন। তিনি সেখান থেকে অন্য একটি গ্রামে যান। সেখান থেকে ফিরে তিনি আবার সেই মহিলার কাছে আসেন। তিনি এক লাখ ফ্রাঙ্ক দেন এবং বলেন, আমার আজকের সারাদিনের আয় এটা- যা আমি আল্লাহ্‌র রাস্তায় পেশ করছি। তিনি বলেন, কয়েকদিন থেকে আমার ঘরে কোনো ভালো খাবার রান্না হয় নি; [সন্তানদের সাধারণ খাবার খাইয়ে দিতেন;] আমার ইচ্ছা ছিল- আজ যা কিছু উপার্জন করব, তা দিয়ে সন্তানদের ভালো কিছু খাওয়াবো। কিন্তু যেমনটি আপনি বলেছেন আর আমারও অভিজ্ঞতা আছে, প্রিয় সম্পদের থেকে আল্লাহ্‌র রাস্তায় কুরবানী করলে তা বিনষ্ট হয় না। আল্লাহ্ তা'লা তো এমন স্থান থেকে ব্যবস্থা করে দেন যে, মানুষ তাকল্পনাও করতে পারে না। আমিও চিন্তা করলাম, আমার কুরবানী বৃথা যাবে না, তাই আমি আজ আমার (বকেয়া চাঁদা) আদায় করে দিচ্ছি। তিনি (তথা মুবাল্লিগ সাহেব) বলেন, স্থানীয় মুয়াল্লিম সাহেব সেখানেই ছিলেন, এমন সময়ে সেই মহিলার কাছে তার ছেলের ফোন আসে যে, আপনাকে দেবার জন্য আমার কাছে কিছু আছে। আপনি অমুক স্থানে চলে আস্ ন এবং এগুলো নিয়ে যান। তিনি ছেলের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। ছেলে তাকে পাঁচ লাখ ফ্রাঙ্কদিয়ে বলে, এগুলো সংসারের খরচের জন্য। ভদ্রমহিলা আনন্দের সাথে ফিরে আসেন এবং এ ঘটনা বলতে আরম্ভ করেন। ইতোমধ্যে আবার ফোন বেজে ওঠে। তার আরেক ছেলে যে অন্য শহরে থাকে- সে বলে, আমি নিকটেই আছি। আমি এক স্থানে যাচ্ছি তাই আপনার কাছে আসতে পারছি না। আপনি আমার কাছে চলে আসু ন। আমার কাছে আপনার জন্য একটি উপহার আছে। তিনি যখন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যান, সেই ছেলেটি তার মাকেতিন লাখ ফ্রাঙ্ক দিয়ে বলে, এটি আপনার প্রয়োজনীয় খরচের জন্য। সেই ভদ্রমহিলা ফেরত এসে বলেন, আমার প্রতি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণই বর্ষিত হয় নি, বরং আমার ঈমানেও উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং আমার ঈমান দৃঢ় হয়েছে (এটি ভেবে) যে, আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে জামা'তের স্বার্থে কুরবানী করার কারণে আমাকে পুরস্কৃত করেছেন। এ বিষয় থেকে আমি এটি অনুধাবন করেছি যে, জামা'ত নিঃসন্দেহে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত; [আল্লাহ্ তা'লা এভাবে (মানুষের) ঈমানকে দৃঢ় করেন;] আর আল্লাহ্ তা'লার রাস্তায় আমরা যে কুরবানী করছি- তা আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই গৃহীত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তো এক লক্ষ দিয়েছিলাম, (অথচ) আল্লাহ্ তা'লা আমাকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে প্রদান করেছেন।

এরপর রয়েছে কাজাখিস্তানের আকতাও শহরের আলী বেগ নামক একজন নিষ্ঠাবান বন্ধুর ঘটনা। তিনি নিয়মিত চাঁদা প্রদান করে থাকেন। প্রত্যেক মাসে সময়মতো চাঁদা প্রদান করেন। কিছুদিন যাবৎ অসুবিধার কারণে চাঁদা প্রদান করতে পারছিলেন না, এমনকি আবশ্যিক চাঁদা ও ওয়াকফে জাদীদ খাতের চাঁদা প্রদানের সময় শেষ হওয়া সত্ত্বেও তা প্রদান করতে পারেন নি। খুবই চিন্তিত ছিলেন। একদিন জুমুআর নামাযের পর নিজেই বলেন, ঋণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল যে-কারণে ব্যাংক একাউন্টই বন্ধ করে দিয়েছিল। আর এ কারণে আমি চাঁদাও প্রদান করতে পারছিলাম না। দোয়া করছিলাম যেন আল্লাহ্ তা'লা ফযল করেন। তিনি বলেন, যে কোম্পানিতে চাকুরি করি সেখানকার কর্মকর্তা একদিন আমাদেরকে একটি ভালো পরিমাণ অর্থ বোনাস হিসেবে প্রদান করেন যার জন্য আমরা এক বছর যাবৎ অপেক্ষমান ছিলাম। কিন্তু সেটি পাওয়ার মতো কোনো পরিস্থিতি দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। যাইহোক, অর্থ পেয়ে যাই এবং আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ঋণও পরিশোধ হয়ে যায় আর বকেয়া চাঁদাও পরিশোধ করে দিই। আলী বেগ সাহেব বর্ণনা করেন, এটি আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ কল্যাণ এজন্য বর্ষিত হয়েছে যেন আমি আমার চাঁদা পরিশোধ করতে পারি।

আল্লাহ্ তা'লা যে ঋণ বাকি রাখেন না এবং অকল্পনীয়ভাবে প্রদান করেন- এ সম্পর্কিত আরেকটি ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার আমীর সাহেব লিখেছেন। এগুলো বিভিন্ন দেশের একই ধরনের ঘটনা। তিনি বর্ণনা করেন, গোল্ডকোস্টের একজন বন্ধু তার ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা এক হাজার ডলার পরিশোধ করে দিয়েছিলেন। আমীর সাহেব বর্ণনা করেন, আমি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলি, এ খাতে অধিক আর্থিক কুরবানী করুন। সাধারণ যারা খুব বেশি স্বচ্ছল তারা তো

বটেই, যারা মধ্যবিত্ত স্বচ্ছল ব্যক্তি- তারা যথোপযুক্ত কুরবানী করেন না।কিন্তু কতিপয় এমন ব্যক্তিও আছেন যারা সেভাবে কুরবানী করে থাকেন, যেমনটি ইনি করেছেন। যদিও অস্বচ্ছল ব্যক্তিদের কুরবানীর তুলনায় তত বড়ো কুরবানী নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা (তথা এরূপ মধ্যবিত্তরা) মোটামুটি ভালোই কুরবানী করে থাকেন। যাহোক, অধিক উপার্জনকারী বা স্বচ্ছলদেরও ঘটনা বর্ণনা করছি যারা জামা'তের স্বার্থে কুরবানী করে থাকেন। সেই বন্ধু এক হাজার ডলার ওয়াদা করেছিলেন এবং পরিশোধও করে দিয়েছিলেন। যখন তার মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় যে, অধিক কুরবানী করুন- তখন তিনি আরো ছয় হাজার ডলার প্রদান করেন; ছয়গুণ অতিরিক্ত আদায় করেন আর এভাবে সর্বমোট সাত হাজার ডলার আদায় করেন। পরবর্তী দিনই একটি ফোনকল আসে; তিনি বলেন, আমার স্ত্রীর কাছে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি থেকে কল আসে; কল করে তারা বলে, আমাদের একটি ইন্স্যুরেন্স ক্লেইম যা প্রক্রিয়াধীন ছিল- যা সম্পর্কে আমরা পূর্বে অবগত ছিলাম না- তা পেয়ে গেছি। এর ফলে আমরা বারো হাজার ডলার অর্থ রিফান্ড হিসেবে লাভ করেছি। সে বন্ধু বলেন, আমি ছয় হাজার ডলার আর্থিক কুরবানী করেছিলাম; আল্লাহ্ তা'লা দুদিনেই দ্বিগুণরূপে আমাকে সে অর্থ ফেরত দিয়েছেন আর এমন স্থান থেকে ফেরত দিয়েছেন যেখান থেকে পাওয়ার কোন আশাই ছিল না।

অতঃপর গিনি-বিসাউয়ের মুবাল্লিগ সাহেব অকল্পনীয়ভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভের দৃষ্টান্ত বর্ণনাপূর্বক একটি ঘটনা লেখেন, একজন নিষ্ঠাবান আহমদী আবু সানিয়া সাহেব দেশের বাহিরে ছিলেন। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো উপযুক্ত চাকরি পাচ্ছিলেন না, যে কারণে তিনি আর্থিক টানাপোড়নে ছিলেন। বিদেশে অবস্থানরত একজন ব্যক্তি, যার কোনো চাকরি নেই, আর্থিক টানাপোড়ন চলছে- তার অবস্থা কেমন হতে পারে! এমতাবস্থায় যদি তার হাতে কোনো টাকা আসে তবে তা তার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হয়ে থাকে এবং নিজের প্রয়োজনে তা ব্যয় করে থাকে। কিন্তু এই পুণ্যবানদের অবস্থা দেখুন! তিনি বলেন, সেই সময় জামা'তের পক্ষ থেকে চাঁদার বিষয়ে আহ্বান জানানো হয়। তাইসেই আহ্বানে 'লাব্বায়েক' বলে সাড়া দিয়ে আবু সানিয়া সাহেব আল্লাহ্র পথে কুরবানী উপস্থাপন করেন; যা কিছু ছিল তিনি তা দিয়ে দেন। যদিও সেই সময় তার কাছে তেমন কোনো অর্থ ছিল না এবং যেটুকু ছিল তা-ই ছিল তার সবচেয়ে প্রিয়, তথাপি তিনি তা আল্লাহ্রপথে দান করে দেন। যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তার কুরবানী অতি দ্রুত গ্রহণ করেন। চাঁদা প্রদানের মাত্র এক সপ্তাহ অতিবাহিত হতে না হতেই একটি কোম্পানি থেকে তার কাছে ফোন কল আসে যে, কোনো সাক্ষাৎকার ছাড়াই তাকে চাকরি প্রদান করা হচ্ছে। [তিনি আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন; কিন্তু তারা বলে, কোনো সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন নেই, কাজে যোগ দিন।] তাই তিনি যেন কাজে যোগদান করেন। আবু সানিয়া সাহেব বর্ণনা করেন, এটি আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানীর কল্যাণ এবং তাঁর সাহায্য প্রদানের এই প্রতিশ্রুতির বাস্তব পূর্ণতা যে,আল্লাহ্ তা'লা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আর আল্লাহ্ এমন আশাতীতভাবে দিয়েছেন যার তিনি আশাও করেন নি।

রাশিয়ার মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লেখেন, ইকরাম জান সাহেব নামের এক নিষ্ঠাবান বন্ধু আছেন। তিনি বলেন, গত মাসে তিনি তার চাঁদা পাঠান। তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে বর্ণনা করেন, গত দুই মাস যাবৎ চাঁদা প্রদান করতে পারছিলাম না এবং আমি খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম (এ কারণে) যে, 'আমি আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি!'ভেবে দেখুন! তারা নতুন আহমদী, দূরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী, কিন্তু কত চিন্তিত (এটি ভেবে) যে, আমাকে আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করতে হবে। কেননা এটি তার দৃঢ়বিশ্বাস যে, এর মাধ্যমেই আমাদের ওপর আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। তিনি বলেন, আমি অনেক দোয়া করছিলাম। মানুষ তার ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্য দোয়া করে থাকে, কিন্তু তার যে চিন্তা ছিল তথা অর্থের বিষয়ে চিন্তা ছিল- তার কারণ ছিল, আমি যেন চাঁদা প্রদান করতে পারি। যাইহোক, তিনি বলেন, আমি অনেক দোয়া করি- আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে সাহায্য করেন, আমি যেন এই সৌভাগ্য থেকে পিছিয়ে না থাকি এবং আমি যেন আল্লাহ্ তা'লার পথে কুরবানী করা থেকে বঞ্চিত থেকে না যাই। একদিন অফিসে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে পুনরায় আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি যেন আমার বেতন দ্রুত পেয়ে যাই। (কেননা) সেখানকার অবস্থা এমন যে, বেতন আটকে থাকে; (তাই তিনি এই দোয়া করছিলেন,) আমি যেন চাঁদা প্রদান করতে পারি। যাইহোক, তিনি বলেন, আমি অফিসে পৌঁছার পর সেই দিনই অপ্রত্যাশিতভাবে বেতন পেয়ে যাই আর আমি দ্রুত আমার চাঁদা প্রদান করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, (কেননা) আমি কুরবানী করা থেকে বঞ্চিত থাকি নি।

ভারত থেকে সেখানকার ইন্সপেক্টর ওয়াকফে জাদীদ সাহেব লিখছেন, একটি জামা'তের জনৈক সদস্যের কাছে যাই। তার ষোলো হাজার রুপি ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা বকেয়া ছিল; তিনি তার কোনো কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কিস্তি প্রদান করার জন্য সেই অর্থ রেখেছিলেন। আমাদের পৌঁছানোর পর তিনি বলেন, আমার ইএমআই -এর কিস্তি যা দিতে হবে, তা পরে দেখা যাবে; যা আদায় করতে হবে তা আমি পরে আদায় করে দেবো। এখন যেহেতু আমার বকেয়া রয়েছে এবং আপনারা আমার কাছে এসেও পড়েছেন,তাই আমি আগে আপনাদের বকেয়া চাঁদা আদায় করে দিচ্ছি। আমরা তাকে বললাম, আপনি এখন কঠিন পরিস্থিতিতে আছেন, এখন আপনি অর্ধেক আদায় করে দিন, বাকিটা পরে আদায় করে দিয়েন। তিনি জবাব দেন, প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার জন্য বের করতে হবে, বাকি বিষয়গুলো আল্লাহ্ তা'লা সমাধান করে দেবেন, ইনশাআল্লাহ্। যদি আমি তাকওয়ার সাথে কাজ করি এবং আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখি, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম ব্যবস্থা করে দেবেন। পরে তিনি ফোনে আমাদের জানান, একটি অর্থ যা বেশ কিছুদিন ধরে আটকে ছিল এবং তা এত তাড়াতাড়ি পাবার আশা ছিল না- তা আকস্মিকভাবে পেয়ে যাই। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা চাঁদার কল্যাণে সব কাজ সম্পাদন করে দিয়েছেন; আমার ঈমানও বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আমি দেখতে পেলাম যে, কুরবানীকারীদের সাথে আল্লাহ্ তা'লা কেমন ব্যবহার করে থাকেন!

গুয়াদেলুপ দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ। জারমিনাদেন নামে সেখানে একজন নও-মোবাঈন যুবক রয়েছেন। তার বয়স ২৮ বছর। বর্তমানে তিনি একজন শিক্ষার্থী। আর সেই গরীব দেশে পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি পার্ট টাইম চাকরিও করেন। তাকে ওয়াকফে জাদীদের গুরুত্ব এবং কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সাধারণত এটিই বলা হয় যে, যারা নও-মোবাঈন আছেন তাদেরকে যেন চাঁদার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করানো হয়, এ দিকে যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। যখন তাকে (এ বিষয়ে) বলা হয় তখন তিনি বলেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে, আমি এতে অংশগ্রহণ করি; কিন্তু এখন আমার কাছে একেবারেই টাকা নেই আর এটিও জানি না যে, পুরো মাস কীভাবে অতিবাহিত করব! এখন এরূপ পরিস্থিতিতে ইচ্ছা পোষণ করা, যখন হাতও একেবারে খালি আর জানাও নেই যে, মাস কীভাবে অতিবাহিত হবে- এমন পরিস্থিতিতেএটি অনেক দুঃসাধ্য এক কাজ। আবার মানুষ যখন টাকা পেয়ে যায় তখন প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় করে। কিন্তু ঈমান আনার পর তাদের বিচিত্র আচরণ হয়ে থাকে। মুবাল্লিগ সাহেব তাকে বলেন, আপনি ছাত্র তাই অনেক বেশি কুরবানী করার প্রয়োজন নেই। আপনার সাধ্যানুযায়ী এক বা দুই ইউরো দিয়ে দেন। আল্লাহ্ তা'লা তো নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব প্রদান করেন। যাইহোক, তিনি বলেন, এক সপ্তাহ পর তিনি মিশন হাউজে আসেন এবং একশ ষাট ইউরো ওয়াকফে জাদীদ খাতে চাঁদা আদায় করেন। আর তিনি বলেন, যেদিন ওয়াকফে জাদীদ খাতে কুরবানী করার সংকল্প করেছিলাম আল্লাহ্ তা'লা সেই সপ্তাহেই আমার অর্থে বরকত প্রদান করেন। যেখানে আমি পার্ট টাইম চাকরি করছিলাম, তারা আমাকে সময়ের পূর্বেই আমার বেতন প্রদান করেন আর অনেক বেশিও প্রদান করেন। কোনো কারণ ছাড়াই অতিরিক্ত দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি নিজেও বুঝি নি, (তারা) কেন (আমাকে) অতিরিক্ত দিয়েছে। অতঃপর কিছুদিন পর পুনরায় তিনি বলেন, আরেকটি মু'জিযা (বা অলৌকিক বিষয়) ঘটেছে। তিনি বলেন, যেদিন আমি একশ ষাট ইউরো প্রদান করেছি, যদিও আমার আরো বেশি প্রদানের ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না; কিন্তু চাঁদা দেওয়ার কিছুদিন পরই অপ্রত্যাশিতভাবে বেশ বড়ো অংকের অর্থ পেয়ে যাই। একটি ট্রেনিং সেন্টার থেকে আমার কিছু টাকা পাওয়ার করার কথা ছিল যা কয়েকবার বলার পরও পাই নি, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা চাঁদার কল্যাণে আমার সেই অর্থও পাইয়ে দিয়েছেন। তাই তিনি অতিরিক্ত একশ চল্লিশ ইউরো ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করেন। কোথায় পরিস্থিতি এমন ছিল যে, অনাহারে দিনাতিপাত করছিলেন, আর কোথায় এই পরিস্থিতি হয়েছে যে, তিনশ ইউরো চাঁদা প্রদান করেছেন!

অনুরূপ আরো অনেক ঘটনা রয়েছে। অনেকে অলৌকিকভাবে অর্থ পেয়েছেন।

কিরগিজস্তান জামা'তের ইউলিয়া গুরনুভা সাহেবা বলেন, আমি যেখানে কাজ করি, তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করি যে, আমার বেতন বৃদ্ধি করা সম্ভব কি না? তখন তারা আমাকে বলে, শুধুমাত্র বোনাসের ক্ষেত্রে তা সম্ভব। আর জানা নেই, বোনাস কত দেওয়া হবে। যাইহোক, তিনি বলেন, অক্টোবর মাসে যখনই আমি বেতনের একটি অংশ পাই তখন সর্ব প্রথম আমি নিজের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করি, যদিও আমাদের নিজেদের অনেক খরচাদি ছিল। এভাবেই তো আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকারের নিদর্শন পাওয়া যায়, কেননা প্রকৃত কুরবানী তো এটিই। আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকারের লক্ষণ হলো, যেই জিনিসকে তুমি প্রিয় জ্ঞান করো- সেটিকে আল্লাহ্ তা'লার পথে ব্যয় করো। সে সময় তার এই অর্থ প্রিয় ছিল, কেননা তার সেই অর্থের প্রয়োজন ছিল আর অনেক খরচাদি ছিল। কিন্তু তিনি বলেন, সর্বপ্রথম আমার জন্য আবশ্যক ছিল, জামা'তের সাথে কৃত অঙ্গীকার যেন পূর্ণ করি। ঠিক সেই মাসের শেষেই আমাকে বলা হয়, আমার বেতন চল্লিশ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে, এছাড়া কাজের মান অনুযায়ী অতিরিক্ত বোনাসও পেতে পারি। আমি অনেক আশ্চার্যান্বিত হই, কেননা বেতন এতটা বৃদ্ধি পেতে পারে- এই প্রত্যাশা আমার একেবারেই ছিল না। একদিন আগেই বিভিন্ন খরচাদির হিসেব করার সময় আমি উপলব্ধি করি, বেতনে প্রায় এত পরিমাণ অর্থই অতিরিক্ত প্রয়োজন ছিল যা আমি পেয়েছি। আমি পূর্বেই ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায় করেছিলাম, কিন্তু এই খরচাদির মধ্যে যে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল ছিল তা সেই অতিরিক্ত বৃদ্ধির মাধ্যমে পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যে অসাধারণ অনুগ্রহ করেছেন, যা অপ্রত্যাশিত ছিল- সেটি চাঁদার কল্যাণেই হয়েছে। তিনি বলেন, আমি আরো একটি বিষয় বলে দিই; আমার আরেকটি ব্যাবসা ছিল যা কিছুদিন যাবৎ আমি চালাচ্ছিলাম; কিন্তু এতে কোনো উন্নতি হচ্ছিল না। তিনি বলেন, এই

বছর নভেম্বরে নিজের ওয়াদা পূর্ণ করেছি এবং ওয়াদা পূর্ণ করার পর ডিসেম্বরে আমার এই ব্যাবসায় মুনাফা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

ইন্দোনেশিয়ার মেন্ডোঙ জামা'তের একজন সদস্যা রামা সাহেবা। তিনিইন্দোনেশিয়ার জাতীয় মিডিয়াতে ফ্রিল্যান্স লেখিকা, শিক্ষিত মহিলা। তিনি বলেন, এই কাজের মাধ্যমে আমি নিজের জীবিকা নির্বাহ করে থাকি। এই বছর বিভিন্ন প্র বন্ধ প্রত্যাখ্যাত হওয়া এবং পুস্তকাদির কম বিক্রয়ের কারণে আমি নিজের ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা পূর্ণ করতে পারি নি। যার কারণে আমি ভীষণ দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতায় ভুগছিলাম। আমি আল্লাহ্‌রপ্রতি ভরসা রেখে নিজের জমানো পুঁজি থেকে কিছু বকেয়া চাঁদা আদায় করি এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করি, হে আল্লাহ! সর্বকিছু তোমার। তুমি আমার মন থেকে এই চিন্তা দূর করে দাও যে, খরচ কীভাবে পূরণ হবে। আমি নামায শেষ করে জায়নামায গোটানোর পূর্বেই একজন বন্ধুর ফোন আসে, যার একটি অনুবাদের জন্য জরুরি ভিত্তিতে আমার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। কাজ শেষ হবার পর সেই বন্ধু আমাকে একটি খাম দেন যাতেসেই পরিমাণ অর্থই ছিল যতটুকু ওয়াকফে জাদীদের ওয়াদা আদায় করার জন্য আমার প্রয়োজন ছিল। আমি তৎক্ষণাৎ সেই অর্থ ওয়াকফে জাদীদ খাতে আদায় করে দিই। এরপর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ কিছুটা এভাবে হয় যে, আমি সম্পাদকের বার্তা পাই, আমার পুস্তক আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত হয়েছে। [তিনি একটি বই লিখেছিলেন।] এখন আমি দশ শতাংশের পরিবর্তে তিরিশ শতাংশ রয়্যালটি পাব। আল্লাহ্ তা'লা আমার কুরবানীর বরকতে আমার পুত্রের জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তির পথ সুগম করে দিয়েছেন, যা বাহ্যত অসম্ভব ছিল। ভদ্রমহিলা আরো বলেন, আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো, যখন থেকে আমি আমার আয় থেকে সর্বপ্রথম চাঁদার অর্থ পৃথক করা শুরু করেছি, আল্লাহ্ তা'লা আমার জাগতিক বিষয়াবলি স্বয়ং সমাধান করে যাচ্ছেন।

এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি আর কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা তা পূর্ণ করছেন!

আমি এখন ঘটনাবলি ছেড়ে দিচ্ছি। এই বছরের ওয়াকফে জাদীদের কার্য ক্রমের প্রতিবেদন তুলে ধরছি। অর্থাৎ জামা'তের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত যেসব রিপোর্ট এসেছে- সেগুলো;যদিও রিপোর্ট পূর্ণাঙ্গীন নয়। বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বিশেষভাবে আফ্রিকা থেকে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট আসতে পারে নি। কিন্তু তবুও যা এসেছে তা আমি উপস্থাপন করছি।

এটি ওয়াকফে জাদীদের ৬৯তম বর্ষ। ৬৮তম বর্ষ সমাপ্ত হলো এবং নতুন বছর আরম্ভ হলো। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ১৪.৯৭ মিলিয়ন বা প্রায় ১৫ মিলিয়ন পাউন্ড (এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ পাউন্ড) মানুষ আর্থিক কুরবানী করেছে [বাংলাদেশি মুদ্রামানে প্রতি পাউন্ড ১৬৩.৯৭ টাকা হিসেবে দাঁড়ায় ২,৪৫৯,৫৫০,০০০ টাকা (দুইশ পঁয়তাল্লিশ কোটি পঁচানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা)]। গত বছরের তুলনায় এটি ১৩ লক্ষ পাউন্ড বেশি, আলহামদুলিল্লাহ্।

প্রথম দুটি স্থানে রয়েছে কানাডা এবং ব্রিটেন। ব্রিটেন এবার সামগ্রিকভাবে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। কিন্তু কানাডা অনেক চেষ্টা করেছে এবং এবছর ব্রিটেনের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে তারা। তৃতীয় জার্মানি, চতুর্থ আমেরিকা, পঞ্চম ভারত, এরপর (ষষ্ঠ) অস্ট্রেলিয়া, এরপর (সপ্তম) মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, এরপর (অষ্টম) ইন্দোনেশিয়া, এরপর (নবম) মধ্যপ্রাচ্যের একটি জামা'ত, দশম স্থানে রয়েছেবেলজিয়াম।

আফ্রিকাতে সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে প্রথম দশটি স্থান অর্জনকারী জামা'তগুলোর নাম পড়ে দিচ্ছি সেই ধারাবাহিকতা অনুসারে; প্রথম ঘানা প্রথম, এরপরযথাক্রমে মরিশাস, বুর্কিনা ফাসো, তানজানিয়া, নাইজেরিয়া, লাইবেরিয়া, গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন, বেনিন, মালি।

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা পনেরো লক্ষের অধিক। এতে বেশি যারা চেষ্টা করেছে তাদের মাঝে রয়েছে নাইজেরিয়া, নাইজার, গাম্বিয়া, গিনি বিসাউ, কঙ্গো ব্রাজাভিল, আইভরি কোস্ট, সেন্ট্রাল আফ্রিকা, কঙ্গো কিনশাসা বেশি উল্লেখযোগ্য; তারা লোকদের অন্তর্ভুক্ত করতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছে।

মোট আদায়ের দিক থেকে ব্রিটেনের দশটি প্রধান জামা'তের মধ্যে প্র থম ইসলামাবাদ, দ্বিতীয় উস্টার পার্ক, তৃতীয় এশ, তারপর ওয়ালসল, অল্ডারশট সাউথ, ফার্নহ্যাম নর্থ, বোর্ডন, ফার্নহ্যাম সাউথ, জিলিংহাম, এরপর অল্ডারশট নর্থ।

পাঁচটি রিজিওনের মধ্যে প্রথম ইসলামাবাদ, তারপর বাইতুল ফুতুহ, তারপর ফযল মসজিদ, তারপর বাইতুল ইহসান, তারপর ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস। দফতর আতফাল যেহেতু ওয়াকফে জাদীদে পৃথক হিসাব হয়, তাতেও যে অবস্থান তা হলো: প্রথম অল্ডারশট সাউথ, এরপর অল্ডারশট নর্থ, এরপর বোর্ডন, এরপর এশ, চিম সাউথ, ফার্নহ্যাম সাউথ, ইসলামাবাদ, রোহেম্পটন ভেল, মিচাম পার্ক, ওয়ালসল।

সামগ্রিক অবস্থানের বিচারে কানাডা দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। কানাডার জামা'তগুলোর মধ্যে প্রথম ভন, এরপর পিস ভিলেজ, এরপর ক্যালগেরি, এরপর ব্রাম্পটন ওয়েস্ট, ভ্যাঙ্কুভার, টরন্টো ওয়েস্ট, মিসিসাগা, ব্রাম্পটন ইস্ট ও টরন্টো।

কানাডার দশটি বড়ো জামা'তের মাঝে প্রথম হ্যামিলটন, এরপর এডমিন্টন ওয়েস্ট, হাদীকায়ে আহমদ, হ্যামিলটন মাউন্টেন, অটোয়া ওয়েস্ট, রেজাইনা, এয়ারড্রি, ইনিসফিল, ভড্রুয়েল ও সাডবেরি।

তাদের আতফালের মধ্যে প্রথম ভন, এরপর টরন্টো ওয়েস্ট, এরপর পিস ভিলেজ, ক্যালগেরি, ব্রাম্পটন ওয়েস্ট, ব্রাম্পটন ইস্ট, ভ্যাঙ্কু ভার, মিসিসাগা, টরন্টো। আর জামা'তের দিক থেকে আতফালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: প্রথম হাদীকায়ে আহমদ, লন্ডন সাউথ (কানাডাতেও একটি লন্ডন আছে), তৃতীয় হ্যামিলটন, (এরপর যথাক্রমে) ইনিসফিল, মন্ট্রিয়াল ওয়েস্ট, বাইতুল ইহসান, সাসকাটুন সাউথ ওয়েস্ট, ডারহাম ইস্ট, উডস্টক, এবটস্‌ফোর্ড, বার্লিংটন।

জার্মানির পাঁচটি স্থানীয় জামা'তের মাঝে প্রথম হামবুর্গ, দ্বিতীয় ফ্রাঙ্কফুর্ট, এরপর(যথাক্রমে) উইসবাদেন, রিডস্টেড, এরপর গ্রস-গেরাউ। (পূর্বের পাঁচটি ছিল লোকাল এমারত,) আর দশটি জামা'ত হলো: রোডগাও, নিডা, নয়েউইড, রোডারমার্ক, ওয়েনগার্টেন, ফ্লোরেসহাইম, বার্লিন, কোবলেনজ, মাহদীআবাদ, পিনিবার্গ।

আতফালদের পাঁচটি রিজিওনের মধ্যে প্র থম উইসবাদেন, এরপর (যথাক্রমে) হামবুর্গ, হিসেন সাউথ-ইস্ট, ম্যানহেইম, ওয়েস্টফ্যালেন।

আমেরিকার দশটি জামা'ত হলো: প্রথম নর্থ ভার্জিনিয়া, এরপর মেরিল্যান্ড, এরপর লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো, সিয়াটল, সিলিকন ভ্যালি, ডালাস, ডেট্রয়েট, সাউথ ভার্জিনিয়া, জর্জিয়া ক্যারোলাইনা।

আতফালের মধ্যে প্রথম মেরিল্যান্ড, এরপর যথাক্রমে অ্যালবেনি, লস অ্যাঞ্জেলেস, নর্থ ভার্জিনিয়া, সিয়াটল, শিকাগো, জর্জি য়া ক্যারোলাইনা, ডালাস, অশকশ, হিউস্টন।

পাকিস্তানেরও অবস্থান আছে, যদিও সামগ্রিক অবস্থানের দিক থেকে পঞ্চম হয়। কারণ সেখানে মুদ্রার মূল্য কমে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রতিকূল অবস্থার পরও আল্লাহর অনুগ্রহে কুরবানীর মান অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। পাকিস্তানে প্রথমে লাহোর, এরপর দ্বিতীয় অবস্থানে রাবওয়া, তৃতীয় করাচি। প্রাপ্তবয়স্কদের চাঁদার মধ্যে জেলাগুলোর অবস্থান হলো: প্রথম ইসলামাবাদ, এরপর ফয়সালাবাদ, তারপর (যথাক্রমে) রাওয়ালপিন্ডি, গুজরাত, সারগোধা, উমরকোট, মুলতান, নারওয়াল, মিরপুর খাস, ডেরা গাজী খান।

প্রথম দশটি জামা'তের মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে ইসলামাবাদ শহর, এরপর টাউনশিপ লাহোর, এরপর (যথাক্রমে) ডিফেন্স লাহোর, দারুয যিকর লাহোর, সামানাবাদলাহোর, আল্লামা ইকবাল টাউন লাহোর, বায়তুল ফযল ফয়সালাবাদ, মুগলপুরা লাহোর, মুলতান শহর এবং দিল্লি গেইট লাহোর।

পাকিস্তানে আতফালের জামা'তগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে লাহোর, দ্বিতীয় স্থানে রাবওয়া, তৃতীয় স্থানে করাচি। জেলা পর্যায়ে প্রথম ইসলামাবাদ, দ্বিতীয় ফয়সালাবাদ,এরপর যথাক্রমে নারোয়াল, রাওয়ালপিন্ডি, উমরকোট, সারগোধা, গুজরাত, মিরপুর খাস, লাইয়া এবং টুবাটেক সিং।

ভারতের প্রাদেশিক জামা'তগুলোর অবস্থান যথাক্রমে প্রথম কেরালা, এরপর তামিলনাড়ু, জম্মু-কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও উত্তরপ্রদেশ।

ভারতের প্রথম দশটি জামা'ত হলো- প্রথম কোয়েম্বে টুর, এরপর হায়দ্রাবাদ, কাদিয়ান, কালিকাট, মেলাপালায়াম, ব্যাঙ্গালুর, মুঙ্গেরি, কলকাতা, কেরেং এবং কেরোলাই।

অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ দশটি জামা'তের মাঝে প্রথম হলো মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, (এরপর যথাক্রমে) মার্সডেন পার্ক, ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন বেরউইক, মেলবোর্ন ক্লাইড, পেনরিথ, পার্থ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট, লোগান ইস্ট এবং মেলবোর্ন ইস্ট। তাদের জামা'তগুলোর অবস্থান হচ্ছে: মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, মার্সডেন পার্ক, ক্যাসেল হিল, মেলবোর্ন বেরউইক, মেলবোর্নক্লাইড, পেনরিথ, মেলবোর্ন ইস্ট, পার্থ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট এবং এডেলেইড ওয়েস্ট। আতফালের মধ্যে তাদের প্রথম স্থানে রয়েছে লোগান ইস্ট, এরপর মেলবোর্ন লং ওয়ারেন, এডেলেইড সাউথ, মেলবোর্ন ওয়েস্ট, লোগান ওয়েস্ট, মেলবোর্ন বেরউইক, ক্যাসেল হিল,

পার্থ, ল্যাম্পটন, এরপর পেনরিথ।আল্লাহ্ তা'লা এ সকল কুরবানীকারীদের ধনসম্পদ ও জনসম্পদে প্রভূত কল্যাণ দান করুন। আমি কতক জামা'তের নাম এজন্য পড়ে দিই কেননা তাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে,আমাদের অবস্থান কী- তা যেন জানিয়ে দেওয়া হয়। তাই রীতি অনুযায়ী এটি পড়া হয়।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, কৃপণতা ও ঈমান কখনোই একই হৃদয়ে সহাবস্থান করতে পারে না। যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ওপর ঈমান রাখে, সে তার সিন্দুকে আবদ্ধ সম্পদকেই কেবল নিজের সম্পদ মনে করে না; বরং সে আল্লাহ্ তা'লার সমস্ত ধনভাণ্ডারকেই নিজের ধনভাণ্ডার মনে করে। আটকে রাখার অভ্যাস তার মধ্য থেকে সেভাবে দূর হয়ে যায়, (অর্থাৎ কৃপণতা তার থেকে দূর হয়ে যায়,) যেভাবে আলো আসলে অন্ধকার দূর হয়ে যায়।"

সুতরাং, এটি আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ। আমরা নিজেরাও প্রত্যক্ষ করেছি, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে একের পর এক অনুগ্রহে ধন্য করে যাচ্ছেন। কারণ তারা অনুধাবন করে যে, সকল কিছুর ভাণ্ডার আল্লাহ্ তা'লার কাছেই রয়েছে। হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার কাছেই সব কিছুর ভাণ্ডার রয়েছে আর তিনি পরকালে তা দান করবেন, কিন্তু ইহজগতেও তিনি তা দান করতে থাকবেন। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা এ কথাই বলেছেন। মানুষ হতবাক হয়ে যায় যে, কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দান করে যাচ্ছেন, আর এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও মানুষজন লাভ করছে, সেরকম কিছু ঘটনাও আমি শুনিয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও আমাদের আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক দান করুনএবং একইসাথে আমাদের ঈমান ও বিশ্বাসেও ক্রমাগত উন্নতি দান করুন। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ ডিসেম্বর, ২০২৫)

**** **** ****

জুমআর খুতবা

“রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর প্রেমে এমনভাবে নিমগ্ন ও আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁর জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাস এবং এমনকি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে গিয়েছিল। তাঁর সত্তার মধ্যে ‘নফস’, সৃষ্টিজগত বা পার্থিব উপায়-উপকরণের কোনো অংশ অবশিষ্ট ছিল না। তাঁর রূহ আল্লাহর দরবারে এমন একনিষ্ঠতার সঙ্গে নত হয়েছিল যে তাতে গায়রুল্লাহ্‌র কণামাত্রও মিশ্রিত ছিল না।”

যৌবনকালেও, নবুওয়তের দাবি করার পূর্বে, তাঁর মধ্যে আল্লাহর প্রেমের যে উচ্ছ্বাস ছিল তা এতই তীব্র ছিল যে তিনি ব্যাকুল হয়ে গুহায় আশ্রয় নিতেন এবং তাঁর প্রিয় রবের সাথে নির্জনে আরজ-নিয়াজ ও ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

মহানবী গঁথধসসধফ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হলেই তাঁর অন্তরে এক বিশেষ উদ্দীপনা সৃষ্টি হতো। সুস্থতা কিংবা অসুস্থতা-সব অবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণ ছিল তাঁর খাদ্যতুল্য। আর এই চেতনা তিনি তাঁর উম্মতের মধ্যেও সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন-যেন তারাও সর্বদা আল্লাহর স্মরণে অভ্যস্ত হয়ে যায়।

সারা জীবন তিনি সর্বপ্রকার উপায়ে চেষ্টা করেছেন মানুষের জিহ্বায় যেন আল্লাহর নাম প্রবাহিত থাকে।

এখন আমাদের নিজেদের পর্যালোচনা করা উচিত-আমাদের হৃদয়ে কি সর্বদা আল্লাহর স্মরণ জীবন্ত থাকে, যেমনটি মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতের কাছে প্রত্যাশা করেছিলেন? আমাদের অন্তরে কি সেই ব্যাকুলতা ও বেদনা আছে? নাকি আমরা কেবল পার্থিব উদ্দেশ্যে নামাজ ও আল্লাহর স্মরণের দিকে মনোযোগ দিই এবং সাধারণ অবস্থায় তাঁকে ভুলে যাই?

ইবাদতের বহু ক্ষেত্রে তিনি মানুষকে আল্লাহর স্মরণের প্রতি মনোযোগী করেছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে তিনি শুধু নিজেই জিকর-এ-ইলাহিতে মগ্ন থাকতেন না, বরং অন্যদেরও তা করতে উৎসাহিত করতেন। এটি তাঁর পরিপূর্ণ প্রেমেরই সাক্ষ্য বহন করে।

প্রমাণস্বরূপ বর্ণিত আছে যে, তিনি নামাজে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে তাঁর পা বা পিণ্ডলী ফুলে যেত। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হতো কেন তিনি এমন কষ্ট স্বীকার করেন, তিনি জবাব দিতেন, “আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?চ-কি প্রেম! কি আবেগ! কি ভালোবাসা! আল্লাহর স্মরণে তিনি এমন নিমগ্ন থাকতেন যে দেহের কষ্টের কোনো অনুভূতিই থাকত না।

‘কুররাতি আঈনি ফিস সলাত’ অর্থাৎ “নামাজে আমার চোখের স্নিগ্ধতা রাখা হয়েছে -হযরত মুসলেহ মওউদ (রাযিয়াল্লাহু ‘আনহু) এই উক্তি সম্পর্কে বলেন: “এটি এমন এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা ইসলাম অন্যান্য ধর্মের উপর স্বাতন্ত্র্য হিসেবে লাভ করেছে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘোষণা করেছেন যে তাঁকে এমন ইবাদত প্রদান করা হয়েছে, যাতে রয়েছে অতুলনীয় স্বাদ-এমন স্বাদ, যার সাথে অন্য কোনো ধর্মের তুলনা হয় না।”

আমাদের লেখনীও তবলীগি জিহাদেও তখনই বরকত আসবে, যখন আমরা আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করবো এবং আল্লাহ তাআলার প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করবো। যদি আমরা এই জিহাদে অংশ নিতে চাই, তবে আমাদের আল্লাহর প্রেম ও আন্তরিক দোয়ার প্রতি মনোযোগী হতে হবে। আমাদের ইবাদতের প্রতিও যত্নবান হতে হবে। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আদর্শ অনুসরণ করেই কেবল আমাদের কর্মে বরকত আসতে পারে।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ১৬ জানুয়ারী, ২০২৬, এর জুমুআর খুতবা (১৬ সুলাহ, ১৪০৫ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা’উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত একটি খুতবায় আমি মহানবী (সা.)-এর সীরাত তথা জীবনচরিতের আলোকে তাঁর ঐশীপ্রেমের দিকটি উল্লেখ করেছিলাম। এ সম্পর্কে ই আজ আরো কিছু বর্ণনা করব।

যৌবনকালে এবং নবুয়ওতের দাবির পূর্বেও মহানবী (সা.)-এর মাঝে খোদাপ্রেমের এমন এক প্র বল উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল যে, এ কারণে তিনি (সা.) ব্যাকুল হয়ে গুহায় চলে যেতেন এবং আল্লাহ্ তা’লার সাথে একান্ত আলাপে নিমগ্ন হতেন।

এই ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন: “আমি লক্ষ করছি, গ্রীষ্মকালের সাথেও আধ্যাত্মিক উন্ন তির এক বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে। মহানবী (সা.)-কে দেখো, আল্লাহ্ তা’লা তাঁকে মক্কার মতো শহরে সৃষ্টি করেছেন এবং এরপর তিনি এই তীব্র গরমের মধ্যে নির্জ নে হেরা গুহায় গিয়ে আল্লাহ্ তা’লার ইবাদত করতেন; তা কত-না বিস্ময়কর যুগ ছিল। তিনি (সা.) নিজেই হয়ত পানির একটি মশক তুলে নিয়ে যেতেন।

আসল বিষয় হলো, যখন আল্লাহ্ তা’লার সাথে গভীর অন্তরঙ্গতা ও আধ্যাত্মিক স্বাদ সৃষ্টি হয়ে যায়, তখন জগৎ ও জগদ্বাসীর প্রতি এক প্রকার ঘৃণা ও অনীহা জন্মে। প্রকৃতিগতভাবেই তখন নির্জনতা ও একাকীত্ব ভালো লাগে। মহানবী (সা.)-এরও এই অবস্থাই ছিল। আল্লাহ্ তা’লার প্রেমে তিনি এমনভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি সেই নির্জনতাতেই পূর্ণ স্বাদ ও তৃপ্তি পেতেন। এমন একটি স্থান -যেখানে কোনো আরাম বা স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ ছিল না, যেখানে যেতেও ভয় লাগত-সেখানে তিনি একাই রাতের পর রাত কাটাতেন। এথেকে এটিও জানা যায়, তিনি কতসাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। যখন আল্লাহ্ তা’লার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় তখন বীরত্বও সৃষ্টি হয়, তাই মু’মিন কখনো ভীরু হয় না। জগৎপূজারীরা ভীরু হয়; তাদের মধ্যে সত্যিকার বীরত্ব থাকে না।”

আল্লাহ্ তা’লার সাথে সম্পর্ক যত সুদৃঢ় হয় এমন মানুষ ততই নির্জনতা ও একাকীত্ব পছন্দ করে- এ কথাটি শুনে কিছু লোক আপত্তি তোলে যে, তাহলে নবী ও রসূলদের স্ত্রী-সন্তান কেন থাকে? [তারা যদি নির্জনতাই এত পছন্দ করেন তবে কেন স্ত্রীসন্তান রাখেন, কেন বিয়েশাদি করেন?] তারা তো বাজারে-বন্দরে চলাফেরা করেন এবং পানাহার করেন। পবিত্র কুরআনেও এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু পরিতাপ! এমন আপত্তি উত্থাপনকারীরা চিন্তা করে না যে, এদের দৃষ্টান্ত তো এমন যেমন কোনো ব্যক্তি কারো দরজায় ভিক্ষা চাইতে যায় এবং অন্য আরেকজন তার বন্ধু, যে কেবল তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছে। এখন সেই বন্ধু যদি তার বন্ধুর সামনে পোলাও ইত্যাদি পেশ করে তাহলে এতে তার (বন্ধুর) কী দোষ? [দুইজন যাচ্ছে, একজন যায় ভিক্ষা চাইতে আর আরেকজন যাচ্ছে বন্ধু হিসেবে। এখন গৃহকর্তা যদি বন্ধুকে যত্নআত্তি করে তাহলে এতে তার (বন্ধুর) অপরাধ কোথায়? অর্থাৎ সেই বন্ধু , যে তার বন্ধুর সাথে দেখা করতে গিয়েছে- তার তো কোনো অপরাধ নেই!] সেই বন্ধু তো তার (বন্ধুর) আহারে তৃপ্তি পায়, কিন্তু সেই ফকির বা ভিখারীকে তো শুকনো রুটির টুকরো দেওয়া হয়। যদি সে বেশিক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে তাহলে (তাকে) ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। দুধরনের ব্যবহার রয়েছে; ভিখারীর সাথে এক ধরনের আচরণ আর বন্ধুর সাথে ভিন্ন ব্যবহার। [অথচ বন্ধুর ক্ষেত্রে এমনটা হয় না যে, তাকে ধাক্কা দেওয়া হবে। বরং তার দীর্ঘ অবস্থান এবং তার পানাহারে গৃহকর্তা স্বয়ং এক প্রকার আনন্দ লাভ

করেন। ফকির বা ভিখারীর সাথে এক ধরনের আচরণ হয় আর বন্ধুর সাথে ভিন্ন ব্যবহার করা হয়।] বন্ধুর সমাদর করা হয়, যত্নআত্তি করা হয়, আর ফকিরকে কিছু দিয়ে বিদায় করা হয়।

তিনি (আ.) বলেন, "নবী ও মা'মুরদের (তথা আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষদের) অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ। তাদের সামনে যা কিছু আসে তা তাদের প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষার ফলে নয়। তারা তো সকল প্রকার স্বাদ ও প্রশান্তি আল্লাহ্ তা'লার যিকর এবং তাঁর মাঝে নিমগ্ন হওয়াতেই খুঁজে পান আর প্র কৃতপক্ষে তারা নির্জনতাকেই পছন্দ করেন, যেখানে তারা তাদের প্রিয়তমের কাছে নিজেদের মনের আকুতি ও আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপন করেন এবং তারা চান- এই অবস্থায় যেন কেউ তাদের দেখতে না পায়। এছাড়া এই সম্পর্কবন্ধন তাদের পূর্ণতার জন্য হয়ে থাকে।" (মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩০৭-৩০৮)

[অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের ভালোবাসার যে বন্ধন রয়েছে, সেটির একটি সর্বোচ্চ মান অর্জনের জন্য এগুলো হয়ে থাকে।]

হেরা গুহায় আল্লাহ্র ইবাদতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.)একটি হাদীসে অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, যা তিনি (সা.) তাকে বলেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন,মহানবী (সা.)-এর প্রতি সর্বপ্রথম যে ওহী শুরু হয়েছিল, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্যস্বপ্ন দেখা। তিনি (সা.) যে স্বপ্ন ই দেখতেন, তা একেবারে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ পেত। [সত্য স্বপ্ন দেখতেন এবং দ্রুত তার ফলে যেত।] এরপর তাঁর অন্তরে নির্জনবাসের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হয় এবং তিনি হেরা গুহায় একাকী থাকতে এবং সেখানে ইবাদত করতে আরম্ভ করেন। এই ইবাদত কয়েক রাত ব্যাপী হতো, যা তিনি নিজের পরিবারের কাছে ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা জাগার পূর্বেই সম্পন্ন করতেন। আর এজন্য তিনি পাথেয় সাথে নিয়ে যেতেন। [অর্থাৎ কিছু খাবার ও পানীয় সাথে নিয়ে যেতেন।] এরপর কিছু দিন অতিবাহিত হলে তিনি (সা.) হযরত খাদিজা (রা.)-র নিকটে ফিরে আসতেন এবং সমপরিমাণ রাতের জন্য পুনরায় আরো কিছু পাথেয় সাথে নিয়ে যেতেন। অবশেষে তাঁর কাছে সত্য (ওহী) আসে এবং সেই সময় তিনি হেরা গুহায় ছিলেন। তাঁর সমীপে ফেরেশতা আসেন এবং বলেন, "পড়ো"। তিনি বলেন, "আমি তো কখনোই পড়ব না" (অর্থাৎ পড়তে জানি না)। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) বলতেন,সেই ফেরেশতা আমাকে (জাপটে) ধরেন এবং আমাকে এত জোরে আলিঙ্গন করেন যে, আমার শক্তি নিঃশেষ হবার উপক্রম হয়। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দেন এবং বলেন, "পড়ো"। আমি বলি, "আমি পড়ব না, আমি তো পড়তেই জানি না।" পুনরায় তিনি আমাকে ধরেন এবং দ্বিতীয়বার সজোরে এমন চাপ দেন যে, আমি অচেতন হয়ে পড়ি। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলেন, "পড়ো"। আমি বললাম, "আমি পড়ব না।" তারপর তিনি আমাকে জাপটে ধরেন এবং তৃতীয়বার সজোরে চাপ দিয়ে ছেড়ে দেন ও বলেন, اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ- اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ-

অর্থাৎ "পাঠ করো তোমার সেই প্রভু -প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন;মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এক জমাট রক্তপিণ্ড থেকে। তুমি পাঠ করো! আর তোমার প্রভু প্রতিপালক পরম দয়ালু ও সবচেয়ে সম্মানিত।"

(সূরা আল-আলাক্: ২-৪)

এই আয়াতগুলো নিয়ে মহানবী (সা.) গুহা থেকে (বাড়িতে) ফিরে আসেন। যখন তিনি হযরত খাদিজা (রা.)-র নিকট বাড়িতে আসেন, তখন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। তিনি (সা.) হযরত খাদিজা (রা.)-কে বলেন, "আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।" অতঃপর তিনি তাঁকে (সা.) চাদর দিয়ে ঢেকে দেন, এরপর তাঁর অস্থিরতা দূর হতে থাকে। তখন তিনি হযরত খাদিজা (রা.)-র কাছে পুরো ঘটনা বর্ণনা করেন এবং বলেন, "আমি নিজের জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করছি।" তখন হযরত খাদিজা (রা.) বলেন, "কখনোই নয়। আল্লাহ্র কসম! আল্লাহ্ আপনাকে কখনোই লাঞ্ছিত করবেন না। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করেন, অসহায়দের বোঝা বহন করেন, সেসব পুণ্যকাজ করেন যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অতিথিসেবা করেন এবং সত্যের পথে বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন। [প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আপনি সর্বদা সত্যের পক্ষ অবলম্বন করেছেন।]"এরপর হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে নিজের চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নওফলের কাছে নিয়ে যান, যিনি আসাদ বিন আব্দুল উযযার পুত্র ছিলেন। ওয়ারাকা সেই ব্যক্তি, যিনি অজ্ঞতার যুগে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং হিব্রু ভাষা লিখতে ও পড়তে পারতেন। ইঞ্জিল থেকে আল্লাহ্ তা'লা যা চাইতেন তা তিনি হিব্রু ভাষায় লিখতেন। তিনি অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ ও দৃষ্টিহীন হয়ে পড়েছিলেন। হযরত খাদিজা (রা.) তাকে বলেন, "হে আমার চাচার পুত্র! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শুনুন।" ওয়ারাকা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি কী দেখছো?" তখন মহানবী (সা.) যা কিছু দেখেছিলেন তা তাকে অবহিত করেন। ওয়ারাকা তাঁকে বলেন, "ইনি সেই শরীয়তবাহী ফেরেশতা, যাঁকে আল্লাহ্তা'লা হযরত মুসা (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন। হায়! আমি যদি সেই সময় যুবক হতাম! হায়! আমি যদি সেই সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার জাতি তোমাকে বহিষ্কার করবে!" তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, "তারা কি আমাকে বের করে দেবে?" তিনি বলেন, "হ্যাঁ। তুমি যে বাণী নিয়ে এসেছ, যখনই কোনো ব্যক্তি এমন বাণী নিয়ে এসেছে তখন অবশ্যই তার সাথে শত্রুতা করা হয়েছে। আর যদি আমি তোমার সেই যুগটি পাই, তবে আমি কোমর বেঁধে তোমাকে সাহায্য করব।" এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করেন এবং ওহীর ধারাও কিছুকালের জন্য স্থগিত হয়ে যায়। (সহীহ বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫-৭)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আসল কথা হলো, কুরআনের শিক্ষার আলোকে আমরা বিষয়টি এভাবে জানতে পারি যে, একদিকে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে নিজের করুণা, আশিস, দয়া এবং কৃপারাজির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন এবং নিজের 'রহমান' বা অযাচিত দানকারী হবার (বিষয়টি) প্রকাশ করেন, আবার অন্যদিকে বলেন, اَنْ لَّیْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰی (সূরা আন-নাজম: ৪০) অর্থাৎ, আর মানুষ তা-ই লাভ করে যার জন্য সে চেষ্টা সাধনা করে। আরো বলেছেন, وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوْا فِیْنَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আল-আনকাবুত: ৭০) অর্থাৎ, আর যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে, (কঠোর সাধনা করে,) আমরা নিশ্চয় তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব। তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা একথা বলে নিজের কল্যাণকে চেষ্টাপ্রচেষ্টা ও সাধনার ওপর নির্ভরশীল করেছেন। অর্থাৎ, তুমি চেষ্টা করলেই কল্যাণ বা অনুগ্রহ লাভ করবে, তাই সাধনা করো। তিনি (আ.) বলেন, এছাড়া এতে সাহাবীদের (রা.) কর্ম পন্থা আমাদের জন্য এক আদর্শ ও উত্তম দৃষ্টান্ত। সাহাবীদের জীবনের প্রতি গভীরভাবে লক্ষ করে দেখো, তাঁরা কি কেবল সাধারণ নামাযের মাধ্যমেই সেই সুউচ্চ মাকাম বা মর্যাদা লাভ করেছিলেন? না, বরং তাঁরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের প্রাণের প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করেন নি এবং ভেড়া-ছাগলের মতো আল্লাহ্র পথে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছেন। তবেই তাঁরা এই উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছিলেন।"

সাহাবীরা মহানবী (সা.)-এর সাহচর্যে ঐশী প্রেম লাভ করার চেষ্টা করেছেন এবং এজন্য সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হয়ে গেছেন আর কুরবানীও করেছেন। এরপর তাঁরা এমন এক পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন, যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তিনি (আ.) বলেন, "আমরা অধিকাংশ মানুষকে এমন দেখেছি যারা চায়, এক ফুৎকারেই তাদেরকে সেই উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে দেওয়া হোক এবং আরশ পর্যন্ত তাদের প্রবেশাধিকারের পথ উন্মুক্ত হোক। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের রসূলে আকরাম (সা.)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? তিনি ছিলেন 'আফযালুল বাশার' (শ্রেষ্ঠ মানব), 'আফযালুর রুসু ল' (শ্রেষ্ঠ রসুল) ও 'আফযালুল আম্বিয়া' (শ্রেষ্ঠ নবী)। তিনিই যেক্ষেত্রে ফুৎকারের মাধ্যমে সেসব কাজ করতে পারেন নি, তাহলে আর কে আছে যে এমনটি করতে পারে? দেখো, তিনি হেরা গুহায় কেমন কঠোর সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন। আল্লাহ্ই জানেন, কত দীর্ঘকাল পর্যন্ত তিনি কাকুতি-মিনতি ও আহাজারি করেছেন। আত্মশুদ্ধির জন্য তিনি কীরূপ প্রাণান্তকর চেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রম করেছেন! তার পর গিয়ে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আশিস অবতীর্ণ হয়েছিল।

আসল কথা হলো, মানুষ আল্লাহ্র পথে যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের ওপর এক মৃত্যু এবং বিলীন হওয়ার অবস্থা আনয়ন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ প্রান্ত থেকে কোনো ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। তবে আল্লাহ্ যখন দেখেন, মানুষ নিজের পক্ষ থেকে চূড়ান্ত চেষ্টাসাধনা করেছে এবং আমাকে পাওয়ার জন্য নিজের ওপর মৃত্যু ডেকে এনেছে, তখন তিনি মানুষের কাছে আত্মপ্র কাশ করেন, তাকে ধন্য করেন এবং নিজ ক্ষমতার নিদর্শন দ্বারা তাকে সম্মানিত করেন।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২০৫-২০৬)

পুনরায় তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, নবীদের প্রকৃতি এমনভাবে গঠিত যে, তাঁরা প্রসিদ্ধি বা খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করেন না। কোনো নবী কখনোই খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা করেননি। আমাদের মহানবী (সা.)-ও নির্জনতা ও একাকীত্ব পছন্দ করতেন। তিনি ইবাদত করার জন্য লোকালয় থেকে দূরে এক নির্জন গুহা তথা হেরা গুহায় চলে যেতেন। এই গুহাটি এমন ভয়ানক ছিল যে, কোনো মানুষ সেখানে যাওয়ার সাহস করত না; কিন্তু তিনি এটিকে এজন্য বেছে নিয়েছিলেন যেন ভয়ে কেউ সেখানে না যায়। তিনি (সা.) সম্পূর্ণ একাকীত্ব চাইতেন। খ্যাতি তিনি কখনোই পছন্দ করতেন না। এরই মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে নির্দেশ আসে, یٰۤاَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ (সূরা আল-মুদ্দাসসির: ২-৩) অর্থাৎ, হে কম্বল পরিহিত (ব্যক্তি)! দণ্ডায়মান হও এবং মানুষকে সতর্ক করো। এই নির্দেশে একটি বাধ্যবাধকতা পরিলক্ষিত হয় এবং এই কারণেই জোরালোভাবে সাথে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে একাকীত্বকে তিনি (সা.) অত্যন্ত পছন্দ করেন- তা যেন এখন বর্জন করেন।"

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৪)

কাজেই, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা যখন পরম মানে উপনীত হয় এবং তাঁর চেষ্টাসাধনাও চূড়ান্ত মানে উপনীত হয়, তখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে স্বীয় সর্বশেষ শরীয়ত প্রচারের জন্য পৃথিবীতে প্রেরণ করেন।

তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি গভীর প্রেম ও ভালোবাসা তো ছিলই, কিন্তু এর সাথে এক কঠোর সাধনাও ছিল, যার ফলে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে অসংখ্য নিয়ামতে ভূষিত করেন। আর প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টাসাধনা না করে, ততক্ষণ আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছানো কঠিন হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় মহানবী (সা.)-এর নামাযের অবস্থা এমন ছিল যে, মুতাররিফ (রা.) তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি মহানবী (সা.)-এর কাছে যাই, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। তাঁর বুকের ভেতর এমন শব্দ বের হচ্ছিল যেমনটি হাঁড়িতে টগবগ করে পানি ফোটার শব্দ হয়।

(সুনান নিসাই, কিতাবুস সহু, হাদীস-১২১৫)

তিনি এমন প্র চণ্ডভাবে কাঁদছিলেন এবং আহাজারি করছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন হাঁড়িতে টগবগ করে পানি ফুটছে।

একইভাবে হযরত আয়েশা (রা.) একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন, যার উল্লেখ আমি গত একটি খুতবায় করেছি, তিনি (সা.) এত বেশি ইবাদত করতেন এবং ইবাদতের সময় এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুত তফসীর, হাদীস-৪৮৩৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর ঐশীপ্রেম এবং ইবাদতের উল্লেখ করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন, [এর কিছু অংশ আমি আগেও বর্ণনা করেছি, গত খুতবার আগের খুতবায়, যেখানে আমি (তাঁর) জীবনচরিত বর্ণনা করেছিলাম, কিন্তু এর আরো কিছু বিশদ বিবরণ রয়েছে, তাও বর্ণনা করছি। এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও অনুরাগের বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে যায়।] হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)লেখেন,হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণ না করেন, যখন মহানবী (সা.) অন্তিম অসুস্থতা বা অন্তিম শয্যায় ছিলেন, তখন প্রচণ্ড দুর্বলতার কারণে নামায পড়াতে সক্ষম ছিলেন না। একারণে তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন। যখন হযরত আবু বকর (রা.) নামায পড়ানো শুরু করেন, তখন তিনি (সা.) কিছুটা আরাম বোধ করেন এবং নামাযের জন্য বের হন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)-কে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার পর যখন তিনি রোগের কষ্ট কিছুটা কম অনুভব করেন, তখন তিনি দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে নামাযের জন্য বের হন। তিনি (রা.) বলেন, সেই মুহূর্তের দৃশ্যটি এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে; প্র চণ্ড ব্যথার কারণে তাঁর পবিত্র পা মাটিতে ছেঁচড়ে যাচ্ছিল। তিনি (সা.) যখন মসজিদে পৌঁছেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) পেছনে সরে আসার উপক্রম করেন, তখন মহানবী (সা.) তাঁর সংকল্প অনুধাবন করতে পারেন এবং তাকে নিজের স্থানে থাকার জন্য ইঙ্গিত করেন। অতঃপর তাঁকে (সা.) সেখানে নিয়ে আসা হয় এবং তিনি হযরত আবু বকর (রা.)-র পাশে উপবিষ্ট হন। এরপর মহানবী (সা.) নামায পড়তে শুরু করেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর নামাযের অনুকরণে নামায পড়তে থাকেন এবং বাকি মানুষজন হযরত আবু বকর (রা.)-র নামাযের অনুসরণ করতে থাকেন।

এই হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁর যত গুরুতর অসুখই হোক না কেন, তিনি আল্লাহ্তা'লাকে স্মরণ করার বিষয়টি ভুলে যেতেন না। সাধারণত মানুষকে দেখা যায়, সামান্য একটু কষ্ট হলেই সব ইবাদত ভুলে যায়। বাজামা'তে নামায এবং অন্যান্য শর্ত পালনে তো প্রায়ই আলস্য দেখা দেয়। কিন্তু তাঁর অবস্থা এমন ছিল যে, সামান্য রোগ তো দূরের কথা, যে রোগে তিনি ইন্তেকাল করেন এবং যার তীব্রতা এমন ছিল যে, তিনি বারবার মূর্ছা যাচ্ছিলেন এবং উঠে দাঁড়াতে অক্ষম ছিলেন- সেই অবস্থাতেও যখন নামায শুরু হয়ে যায়, তখন তিনি চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা সহ্য করতে পারেন নি। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে, (চরম) দুর্বলতা সত্ত্বেও, টলমল পায়ে বাজামা'তে নামাযের জন্য মসজিদে গমন করেন। যদিও বাহ্যত এ বিষয়টি সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সেই অবস্থার প্রতি একটি লক্ষ করুন, যাতে তিনি আক্রান্ত ছিলেন। এরপর তাঁর যিকরে ইলাহীর (তথা আল্লাহকে স্মরণ করার) সেই গভীর আগ্রহের প্রতি লক্ষ করুন, যার বশবর্তী হয়ে তিনি নামাযের জন্য দুইজন মানুষের কাঁধে ভর দিয়ে (মসজিদে) উপস্থিত হন। তাহলে বুঝতে পারবেন, এই ঘটনাটি কোনো সাধারণ ঘটনা ছিল না; বরং তাঁর হৃদয়ে যিকরে ইলাহীর যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, এটি তা বহিঃপ্রকাশের একটি দর্পণ। প্রত্যেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি অনুধাবন করতে পারবেন যে, যিকরে ইলাহী ছিল তাঁর (সা.) খোরাক এবং এটি ছাড়া তিনি তাঁর জীবনে কোনোই স্বাদ পেতেন না। এরই প্রতি তিনি (সা.) ইঙ্গিত করেছেন, যেসব জিনিসকে আমি ভালোবাসি তার মধ্যে একটি হলো: 'কুররাতু আঈনি ফিস সলাত'।অর্থাৎ, নামাযে আমার চোখ স্নিগ্ধতা লাভ করে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে তাঁর বাজামা'তে নামায পড়া বা মসজিদে আসা কোনো আবশ্যকীয় বিষয় ছিল না। কারণ অসুস্থতার সময় ইসলামী শরীয়ত কাউকে এসব শর্ত পূরণ করতে বাধ্য করে না। অসুস্থ হলে বাড়িতে নামায পড়া যেতে পারে। কিন্তু এটি ছিল 'প্রেমের শরীয়ত'। একটি ছিল শরীয়তের নির্দেশ, কিন্তু মহানবী (সা.) যে শরীয়তের ওপর আমল করেছেন তা ছিল 'ভালোবাসার শরীয়ত', যা ছিল মহানবী (সা.)-এর ব্যবহারিক আমল। ওগুলো তো শরীয়তের বিধিবিধান, কিন্তু এটি ছিল ভালোবাসার শরীয়ত, অনুরাগের বিষয়। এগুলো ছিল ভালোবাসার বিধান যা এর (তথা শরীয়তের বিধানের) উর্ধ্বে ছিল। এর ভেতর থেকে ভালোবাসা ও অনুরাগ ঝরে পড়ছিল।

যদিও শরীয়ত তাঁকে অবকাশ দিয়েছিল, তিনি চাইলে বাড়িতেই নামায পড়তে পারতেন; কিন্তু যিকরে ইলাহীর প্রতি তাঁর যে (গভীর) ভালোবাসা ছিল, তা তাঁকে বাধ্য করত- যা-ই হোক না কেন, তিনি যেন সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করে, সকল শর্তাবলি সহকারে যিকরে ইলাহী করেন এবং নিজের প্রিয়তমকে স্মরণ করেন।

এমন কষ্টের অবস্থায়ও যখন যিকরে ইলাহীর সাথে তাঁর এরূপ সম্পৃক্ততা ছিল, তাহলে সুস্থ থাকাকালে অবস্থা কেমন ছিল- তা অনুমান করা যেতে পারে। মানুষ চিন্তা করতে পারে, তিনি কত আবেগের সাথে তাঁর প্রিয়তমের যিকর বা স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন।

আল্লাহ্ তা'লার সাথে মহানবী (সা.)-এর এমন নিবিড় সম্পর্ক ছিল যে, আল্লাহ্ তা'লার উল্লেখ হওয়ামাত্রই তাঁর মাঝে এক প্রকার ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে যেত। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর এমন গভীর ভালোবাসা ছিল যে, সুস্থতা ও অসুস্থতা- উভয় অবস্থায় আল্লাহ্ তা'লার স্মরণই ছিল তাঁর খোরাক। আর এটিই তিনি তাঁর উম্মত এবং তাঁর অনুসারীদের মাঝে সৃষ্টি করতে চেয়েছেন ,যেন তাদের মাঝেও এই অভ্যাস গড়ে ওঠে।

যেমনটি পূর্বের খুতবায় আমি তাঁর (সা.) জীবনচরিত বর্ণনা করেছিলাম এবং একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস বর্ণনা করেছিলাম; তাতে এমন কিছু বিস্তারিত বিষয় রয়েছে যা পুনরায় বর্ণনাযোগ্য। তাই আমি তা বর্ণনা করছি।মহানবী (সা.) একবার বনী আমর বিন অউফ গোত্রের মাঝে বিবাদ মীমাংসা করিয়ে দেওয়ার জন্য গিয়েছিলেন। [তাদের মধ্যে কোনো ঝগড়াবিবাদের বিষয় ছিল, তিনি (সা.) তা মীমাংসা করতে গিয়েছিলেন।] এর মধ্যে নামাযের সময় হয়ে যায় এবং মসজিদে নববীতে মুয়াযযিন আযান দেন এবং এরপর হযরত আবু বকর (রা.)-র কাছে এসে বলেন, "আপনি কি লোকদের নামায পড়াবেন? আমি কি ইকামত দেবো?" তিনি (রা.) উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ (ঠিক আছে)।" এরপর হযরত আবু বকর (রা.) নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হন। ইতোমধ্যে মহানবী (সা.)-ও চলে আসেন। লোকেরা তখন নামায পড়ছিল। তিনি (সা.) এসময়ে একটি পথ অতিক্রম করে সামনে চলে যান এবং প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ান। তাঁর (সা.) আগমনের বিষয়টি বুঝতে পেরে লোকেরা তালি দিতে আরম্ভ করে যেন হযরত আবু বকর (রা.) বুঝতে পারেন। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) নামাযে অন্য কোনো দিকে মনোযোগ দিতেন না; নামাযে ও ইবাদতে তাঁর এক অদ্ভুত মগ্নতা ছিল এবং অন্য কোনো দিকে তার খেয়াল থাকত না। যখন তালি দেওয়া দীর্ঘায়িত হয়, তখন হযরত আবু বকর (রা.) মনোযোগী হন এবং বুঝতে পারেন, মহানবী (সা.) এসেছেন। মহানবী (সা.) তঁ ার দিকে ইঙ্গিত করেন যে, "নিজের জায়গায় অবস্থান করো (অর্থাৎ নামায পড়াতে থাকো)।" তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজের হাত তোলেন এবং এই সম্মান প্রদানের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসাকীর্তন করেন। এরপর তিনি (রা.) পেছনে সরে এসে কাতারে দাঁড়ান এবং মহানবী (সা.) সম্মুখে এগিয়ে যান ও নামায পড়ান। সালাম ফেরানোর পর তিনি (সা.) বলেন, "হে আবু বকর! আমি যখন নির্দেশ দিয়েছিলাম, তখন তোমাকে নামায পড়াতে কোন বিষয়টি বাধা দিয়েছিল?" এর উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, [যেমনটি আমি আগেও বলেছি], "ইবনে আবি কুহাফার এমন কী যোগ্যতা আছে যে, মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে নামায পড়াবে!"

অতঃপর মহানবী (সা.) লোকদের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং বলেন, "আমি লক্ষ করেছি, তোমরা অনেক তালি দিয়েছ। নামাযের মধ্যে যদি কোনো ঘটনা ঘটে (বা সমস্যা দেখা দেয়) তাহলে 'সুবহানাল্লাহ্' বলা উচিত; কারণ যখন নামাযী 'সুবহানাল্লাহ্' বলবে, তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেদিকে (ইমামের) মনোযোগ নিবদ্ধ হবে। আর তালি দেওয়া তো মহিলাদের কাজ।"

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন, এই হাদীসটি থেকে যদিও আরো অনেক শিক্ষা পাওয়া যায়, কিন্তু এই স্থানে আমি কেবল একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আর তা হলো- মহানবী (সা.)-এর সারা জীবনের প্রচেষ্টা এটাই ছিল যে, যেভাবে হোক- মানুষের মুখে যেন আল্লাহর নাম জারি করা যায়।

যুগ ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! কাজ তারাই করতে পারে, অর্থাৎ ধর্মের সেবা তারাই করতে পারে যাদের মধ্যে স্বর্গীয় জ্যোতি বিদ্যমান।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৩)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagbangola, (Murshidabad)

তিনি নিজে যেভাবে যিকর বা আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল থাকতেন– তার অবস্থা তো বর্ণিত হয়েছেই, কিন্তু এই হাদীস থেকে এটি জানা যায় যে, তিনি প্রত্যেকের মুখেও এই শব্দগুলোই দেখতে চাইতেন।

এখন আমাদের দেখা উচিত এবং আত্মপর্যালোচনা করা উচিত, আমাদের হৃদয়েও কি সব সময় আল্লাহ্‌ তা'লার স্মরণ বা চিন্তা থাকে, যেমনটি মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতের কাছে প্রত্যাশা করতেন? আমাদের হৃদয়ে কি সেই পরিমাণ ব্যথা বা আকুতি আছে, নাকি আমরা কেবল আমাদের পার্থিব উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই নামায এবং আল্লাহ্‌ তা'লার যিকরের দিকে মনোযোগ দিই এবং সাধারণ অবস্থায় ভুলে যাই?

অতঃপর তিনি (রা.) লেখেন, এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা থেকে জানা যায় যে,তিনি (সা.) চাইতেন যেন আল্লাহ্‌ তা'লার যিকর অধিক পরিমাণে করা হয়। অতএব হাঁচি দেওয়ার সময়, খাবার শুরু করার সময়, আবার তা শেষ করার পর, ঘুমানোর সময়, জাগ্রত হওয়ার পর, নামাযের পর, কোনো বড়ো কাজ করার সময়, ওযু করার সময়– মোটকথা,অধিকাংশ কাজেই তিনি (সা.) মানুষকে আল্লাহ্‌ তা'লার যিকরের প্রতি মনোযোগী করেছেন। যা থেকে প্রমাণ হয়, তিনি কেবল নিজেই যিকরে ইলাহী তথা আল্লাহ্‌র স্মরণে মশগুল থাকতেন না, বরং অন্যদের কাছ থেকেও এটাই চাইতেন যে, তারাও যেন আল্লাহ্‌র স্মরণে মগ্ন থাকে, যা তাঁর পূর্ণ ভালোবাসার প্রমাণ বহন করে এবং এ কথারই দলিল।

হযরত মু সলেহ্‌ মওউদ (রা.) লিখেছেন , আমি অনেক মানুষকে দেখেছি যারা সামান্য ইবাদত করেই অহংকারী হয়ে যায়। কয়েক দিনের নামায বা ইবাদতের পর তারা নিজেদেরকে ঢাল-তলোয়ারহীন ফেরাউন কিংবা 'ফখরে আউলিয়া' (ওলীগণের গর্ব) ভাবতে শুরু করে এবং দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু আছে– তা তাদের দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্যের বস্তু হয়ে যায়। তাদের কাছে বড়ো বড়ো মানুষেরও কোনো গুরুত্বই থাকে না। মানুষ তো দূরে থাক, তারা আল্লাহ্‌ তা'লার ওপরও নিজেদের অনুগ্রহ প্রকাশ করে এবং মনে করে, ইবাদত করে তারা যেন আল্লাহ্‌ তা'লার ওপর দয়া করেছে এবং তিনি (নাউযুবিল্লাহ্‌) তাদের কাছে এজন্য ঋণী যে, তারা তাঁর ইবাদত করেছে; নতুবা ইবাদত না করলে তিনি কী-ইবা করতে পারতেন! আর যারা এরূপ প্রকৃতির নয়, অর্থাৎ যারা এই সীমা পর্যন্ত পৌঁছায় না– তাদের মধ্যেও অনেককে এমন দেখা গিয়েছে যে, 'আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য কী করছেন'– এই কথা বলার মতো পর্যায়ে যদি তারা না-ও চলে গিয়ে থাকে, তবুও তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রে এটিই দেখা গেছে যে, ইবাদত করার পর তাদের মাঝে কিছুটা অহংকার অবশ্যই চলে আসে। আর খুব কম সংখ্যক মানুষই এমন আছে যারা ইবাদতের পরেও নিজেদের বিনয়ী অবস্থায় অটল থাকে। এটিই পুণ্যবানদের দল যারা স্বীয় ইবাদতের ওপর বিনম্রভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকে; এটাই সেই নেক লোকদের দল যারা বিনয়ের সাথে জীবন যাপন করে এবং সর্বদা ইবাদত করার পরও তা গোপন রাখে। তারা আল্লাহ্‌ তা'লার প্র তি ভালোবাসাকেও গোপন রাখে এবং এটিকেও আল্লাহ্‌ তা'লার অনুগ্রহ মনে করে যে, তিনি আমাদের এই সামর্থ্য দিয়েছেন যেন আমরা ইবাদতকারী হতে পারি। প্র কৃতপক্ষে এরাই পুণ্যবান মানুষের দল।

মানুষ জিজ্ঞেস করে, পুণ্য কী? বর্তমানে শিশু-কিশোররাও প্রায়ই এই প্রশ্ন করে থাকে। (আর এ-ও জিজ্ঞেস করে যে,) কীভাবে বুঝব- আল্লাহ্‌ তা'লা সন্তুষ্ট হয়েছেন? আল্লাহ্‌ তা'লা এভাবেই সন্তুষ্ট হন যে, পুণ্যকর্ম করো এবং তা কেবল আল্লাহ্‌ তা'লার সন্তুষ্টির জন্যই করো। মানুষ নিজের পর্যালোচনা নিজেই করতে পারে, বাইরের কোনো মানুষকে বিচারক বানানোর প্রয়োজন নেই। মানুষ নিজেই বুঝতে পারে, সে যেসব পুণ্য করছে তা যদি আল্লাহ্‌ তা'লার জন্য করে থাকে, তবে আল্লাহ্‌ তা'লা নিশ্চয়ই তা পছন্দ করেন।

তিনি (রা.) লিখেছেন, তাহলে আপনি নিজেই অনুমান করতে পারেন যে,পুণ্যবানদের নেতা এবং নবীকুল শিরোমণি হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর অবস্থা কেমন ছিল? তিনি তো সকল গুণের সমাহার এবং সকল পুণ্যের উৎস ছিলেন। অহংকার বা গর্ব প্রদর্শনের জন্য ইবাদত করা তো দূরের কথা, তিনি আল্লাহ্‌ তা'লার বন্দেগী বা ইবাদত যত বেশি করতেন, তাঁর ব্যাকুলতার অগ্নি তত বেশি তীব্রতর হতো। ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তা'লাকে নিজের প্র তি কৃতজ্ঞ করার পরিবর্তে তিনি নিজেই কৃতজ্ঞতাবশে লজ্জিত হতেন যে, হে আল্লাহ্‌! ইবাদতের এই যে তৌফিক লাভ হচ্ছে– তা তো তোমারই কৃপায় অর্জিত হচ্ছে! তাঁর ইবাদত এক অবিরাম ধারার ন্যায় ছিল। সময়ের কিছু অংশ যখন ইবাদতে কাটাতেন তখন তিনি চিন্তা করতেন, আল্লাহ্‌ তা'লার বড়োই অনুগ্রহ যে, তিনি এই কাজের তৌফিক দান করেছেন এবং এই অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা আদায় করা আবশ্যক। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সেই আবেগেই আত্মহারা হয়ে তিনি আরো কিছু ক্ষণ ইবাদত করতেন। পুনরায় সেটাকেও আল্লাহ্‌ তা'লার একটি অনুগ্রহ মনে করতেন যে, কৃতজ্ঞতা আদায় করাও প্রত্যেকের কাজ নয়, যতক্ষণ না আল্লাহ্‌ তা'লার অনুগ্রহ হয়। [অর্থাৎ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের যে তৌফিক লাভ হয়েছে, সেটিও আল্লাহ্‌ তা'লার অনুগ্রহের কারণেই হয়েছে।] ফলে আরো বেশি তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশ পেত এবং তিনি পুনরায় তাঁর প্রভুর ইবাদতে মশগুল হয়ে যেতেন। এই গোপন আলাপ ও মিনতির ধারা এতই দীর্ঘ হতো যে, বারংবার ইবাদত করতে করতে তাঁর পা ফুলে যেত। সাহাবীগণ নিবেদন করতেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনার এত ইবাদতের কী প্রয়োজন? আপনার তো পূর্বাপর সকল ত্রুটি ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে! এর উত্তরে তিনি কেবল এটাই বলতেন, তবে কি আমি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রা.) বর্ণনা করেন, রসূল করীম (সা.) নামাযের জন্য যখন দাঁড়াতেন তখন দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। পূর্বেও এই হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁর পায়ের পাতা বা গোছা ফুলে যেত। মানুষ যখন তাঁকে বলত , আপনি কেন এমনটি করেন? তখন তিনি উত্তর দিতেন, আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? আল্লাহু আকবার! কেমন প্রণয় আর কেমন ভালোবাসা আর কেমন প্রেম এটি! তিনি (সা.) আল্লাহ্‌ তা'লার স্মরণে দণ্ডায়মান হলে নিজের শরীর ও অস্তিত্বের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই তাঁর থাকত না।

রক্ত সঞ্চালন নিম্নমুখী হওয়ার ফলে তাঁর পা ফুলে যেত, কিন্তু (আল্লাহ্‌র) ভালোবাসা সেদিকে খেয়ালই যেতে দিত না। আশপাশের মানুষ দেখে অবাক হয়ে যেত যে, এ তিনি (সা.) কী করছেন! তাঁর সেই কষ্ট দেখে তারা অর্থাৎ আশপাশের লোকজন ব্যথা অনুভব করত। তারা এদিকে তাঁর (সা.) মনোযোগ আকর্ষণ করে বলতেন, আপনি কেন এমন করছেন? কেন নিজেকে এই কষ্টের মাঝে ফেলছেন এবং এত দুঃখ সইছেন? অন্তত কিছুটা তো নিজের স্বাস্থ্য এবং নিজের আরামের চিন্তা করা উচিত। কিন্তু সেই দুঃখ যা মানুষকে অস্থির করে দেয় এবং যা দেখে অন্যরা প্রভাবিত হয়, তা তাঁর ওপর কোনো প্রভাব ফেলত না। ইবাদতে কোনো প্রকার অলসতা করা কিংবা ভবিষ্যতে এত দীর্ঘ সময় ধরে নিজ প্রভুর স্মরণে দাঁড়িয়ে থাকার অভ্যাস বর্জন করার পরিবর্তে তিনি তাদের এই কথা অপছন্দ করতেন এবং তাদেরকে উত্তর দিতেন, আমি কি আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না? তিনি আমার ওপর এত অনুগ্রহ করেন, এত কৃপা করেন, আমার প্রতি এত স্নেহময় ব্যবহার করেন, তবে কি তাঁর এই উত্তম ব্যবহারের বিনিময়ে আমি তাঁর নামের যিকর বা স্মরণ করব না? তাঁর বন্দেগী বা ইবাদতে আসলত্য প্রদর্শন শুরু করে দেবো?

কত-না নিষ্ঠাপূর্ণ এবং কত-না কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এই উত্তর, আর কীভাবে এটি তাঁর হৃদয়ের পবিত্র আবেগসমূহকে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করছে! আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং তাঁর যিকরের এই ব্যাকুলতা কি আর কারো হৃদয়ে আছে? অন্য কেউ কি এর কোনো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে পারে? অন্য কোনো জাতির কোনো মহাপুরুষ কি তাঁর এই নিষ্ঠার মোকাবিলা করতে পারে?কিন্তু দেখুন, একদিকে তিনি নিজে যেমন এটি করতেন, তেমনিভাবে নিজ উম্মতের কাছেও এই প্রত্যাশা রাখতেন যে, তারাও যেন এমনটিই করে।

অতঃপর তিনি অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্‌ মওউদ (রা.) এরই ধারাবাহিকতায় বলেন, তিনি (সা.) কীভাবে নিজের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন! এমনটি ছিল না যে, কেবল ইবাদত করলেন আর বাকি সব কাজ শেষ হয়ে গেল। আর এমনও ছিল না যে, তিনি (সা.) রাতের বেলা ইবাদতের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন এবং সারা দিন ঘুমিয়ে কাটাতেন । কারণ যদি এমনটি হতো, তাহলে সেই অনুরাগ ও ব্যাকুলতার কথা জানা যেত না যা এই অবস্থায় বিদ্যমান যে, সারা দিনও তিনি (সা.) আল্লাহ্‌ তা'লার নামের

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্‌ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

প্রচার এবং তাঁর আনুগত্য ও আজ্ঞানুবর্তিতা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি (সা.) নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমাম হয়ে নামায পড়াতেন। দূরদূরান্ত থেকে যেসব প্রতিনিধিদল ও দূত আসত, তিনি নিজেই তাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং তাদের দাবি -দাওয়ার উত্তর দিতেন। যুদ্ধের নেতৃত্বও তিনি নিজেই দিতেন। সাহাবীদেরকে কুরআন শরীফের শিক্ষাও দিতেন, আবার নিজেই বিচারকও ছিলেন। সারাদিন মানুষের মধ্যে যত ঝগড়া-বিবাদ হতো, তিনি সেগুলোর মীমাংসা করতেন। সম্পদের ব্যবস্থাপনা, বায়তুল মালের ব্যবস্থাপনা, দেশের ব্যবস্থাপনা, ইসলামের প্র চার ও প্রসার, স্ত্রীদের অধিকার পূরণ, অতঃপর ঘরের কাজকর্মে অংশ নেওয়া- এই সমস্ত কাজ তিনি (সা.) দিনের বেলায় করতেন। আর এই সব কাজ সম্পন্ন করার পর ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে সূর্য না ওঠা পর্যন্ত মাথা না তোলার পরিবর্তে তিনি বারবার উঠে বসতেন এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতেন। আর মাঝরাত অতিবাহিত হওয়ার পর উঠে ওযু করতেন এবং যখন চারিদিকে নীরবতা ও নিস্তব্ধতা ছেয়ে থাকত, তখন সম্পূর্ণ একাকী নিজ প্রভুর দরবারে অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতার সাথে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতেন। আর তিনি (সা.) এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর পদযুগল ফুলে যেত। এমনকি আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, একবার আমিও তাঁর (সা.) সাথে নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম, তখন আমি এত কষ্ট অনুভব করলাম যে, আমি নামায ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল; কারণ আমার পা তখন আর বেশি ভার সহ্য করতে পারছিল না এবং এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা আমার শক্তির বাইরে ছিল। এটি ছিল সেই ব্যক্তির বক্তব্য যিনি যুবক ছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো ছিলেন। এ থেকে বোঝা যায়, তাঁর (সা.)সাহস ও ভালোবাসার আবেগ এত তীব্র ছিল যে, বার্ধক্য এবং সারাদিন কাজকর্মে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি ইবাদতে এত দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, যুবকরা এমনকি শক্তিশালী যুবকরাও- যাদের কাজ তাঁর কাজের তুলনায় নগণ্য ছিল- তারাও তঁ ার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতে পারত না এবং ক্লান্ত হয়ে পড়ত। এই ইবাদত কেন ছিল? কী কারণে ছিল? তিনি এই কষ্ট কেন করতেন? তিনি এই কষ্ট সহ্য করতেন কেবল একারণে যে, তিনি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন এবং তাঁর হৃদয় আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি দেখে সব সময় তাঁর যিকরের প্রতি অনুরাগী থাকত।

[সীরাতুন্নবী (সা.), প্রণেতা- হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.),১ম খণ্ড, পৃ: ১৩১-১৪০]

আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর এক প্রগাঢ় ভালোবাসা ছিল।আবু সালমা বিন আব্দুর রহমানের একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-কে জিজ্ঞেস করেন, রমযানে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নামায কেমন হতো? এখনও এক মাস পর রমযান আসছে। আমরা তো রমযানে ইবাদত করিই, তবে আগেও করা উচিত। যাইহোক, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, তিনি (সা.) রমযানে বা অন্য কোনো মাসে এগারো রাকআতের বেশি পড়তেন না। নামায কেমন হতো? তিনি বলেন, তিনি (সা.) যে নফল আদায় করতেন তা এগারো রাকআতের বেশি হতো না। তিনি (সা.) চার রাকআত পড়তেন, আর সেগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস কোরো না; কত-না সুন্দর ও দীর্ঘ হতো সেসব নামায। পুনরায় তিনি (সা.) চার রাকআত নামায পড়তেন এবং সেগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে তুমি জিজ্ঞেস কোরো না। অতঃপর তিনি (সা.) তিন রাকআত নামায পড়তেন। আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্‌র রসুল (সা.)! আপনি কি বিতর পড়ার আগে ঘুমিয়ে পড়েন? অর্থাৎ চার রাকআত পড়ে তারপর সামান্য বিশ্রাম নেন, এরপর বিতর পড়েন? তিনি (সা.) বলেন, আমার চোখ ঘুমায় ঠিকই, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না, তা তো আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় জাগ্রত থাকে।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৫৬৯)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর সীরাত বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে তাঁর ঐশী নৈকট্য সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা অন্য এক স্থানে এই ঐশী নৈকট্য সম্পর্কে এভাবে বলেছেন যে, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সূরা আল-আনাম: ১৬৩)

অর্থাৎ, "তুমি (তাদের) বলে দাও, 'আমার নামায এবং আমার কুরবানী আরআমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহ্ তা'লারই জন্য যিনি সমস্ত জগতের প্রতিপালক'।"

অর্থাৎ লোকদের জানিয়ে দাও, আমার অবস্থা এমন যে, আমি আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছি। আমার সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে যে, প্র ত্যেক মানুষ- যতক্ষণ না সে কামেল তথা পরিপূর্ণ হয়- ততক্ষণ আল্লাহ্‌র জন্য একনিষ্ঠভাবে ইবাদত করতে পারে না। বরং তার কিছু ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য হয় আর কিছু হয়ে থাকে নিজের নফস বা ব্যক্তিসত্তার জন্য; কারণ সে নিজব্যক্তিসত্তার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব কামনা করে, যেমনটি আল্লাহ্‌র মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা উচিত, আর এটিই ইবাদতের মর্মবাণী। আর একইভাবে তার ইবাদতের একটি অংশ সৃষ্টির জন্য হয়ে থাকে। কারণ যে মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব, ক্ষমতা ও আধিপত্যকে আল্লাহ্‌র জন্য নির্দিষ্ট করা উচিত, সেই মহিমা ও ক্ষমতার অংশ সে সৃষ্টিকেও প্রদান করে। তাই সে যেমন আল্লাহ্‌র উপাসনা করে, তেমনই নফস ও সৃষ্টিরও উপাসনা করে; বরং সাধারণভাবে সমস্ত জাগতিক উপকরণকে নিজের উপাসনার অংশীদার করে নেয়। দুনিয়ার যে-সব তুচ্ছ উপকরণ রয়েছে সেগুলোকে অংশীদার করে, কারণ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও তকদীরের বিপরীতে সে এই উপকরণগুলোকেও ইহজগত ও এর কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তারকারী মনে করে।সুতরাং এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার সত্য উপাসক হতে পারে না, যে কখনও নিজের নফসকে আল্লাহ্‌র মহিমার অংশীদার করে, আবার কখনও সৃষ্টিকে এবং কখনও উপকরণসমূহকে। বরং সত্য উপাসক সে-ই, যে আল্লাহ্‌র সমস্ত মহিমা, সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং সমস্ত আধিপত্য কেবল আল্লাহ্‌কেই অর্পণ করে, অন্য কাউকে নয়। আর যখন মানুষের উপাসনা তওহীদের এই স্তরে পৌঁছায়, তখনই সে প্রকৃতরূপে আল্লাহ্‌র উপাসক অভিহিত হতে পারে। আর এমন মানুষ মুখে যেমনটি বলে যে, আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, অর্থাৎ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে, তেমনিভাবে সে নিজের কর্মের দ্বারা অর্থাৎ নিজের ইবাদতের দ্বারাও আল্লাহ্‌র তওহীদের সাক্ষ্য প্রদান করে। সুতরাং এই পূর্ণ স্তরের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যা উপরোক্ত আয়াতে মহানবী (সা.)-কে বলা হয়েছে যে, তুমি মানুষকে বলে দাও- আমার সমস্ত ইবাদত আল্লাহ্‌র জন্য; অর্থাৎ আমার ইবাদতে নফস, সৃষ্টি এবং জাগতিক উপকরণের জন্য কোনো অংশ নেই। অতঃপর বলা হয়েছে, আমার কুরবানীও বিশেষত আল্লাহ্‌র জন্য, আমার জীবনও আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমার মরণও আল্লাহ্‌র জন্য। মনে রাখা উচিত, আরবী ভাষায় 'নাসীকা' কুরবানীকে বলা হয় এবং আয়াতে বিদ্যমান 'নুসুক' শব্দটি তার বহুবচন; আর এর দ্বিতীয় অর্থ ইবাদতও বটে। সুতরাং এখানে এমন শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ ইবাদত এবং কুরবানী উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এটি এই বিষয়ের প্রতি ইশারা করছে যে, পরিপূর্ণ ইবাদত- যার মাঝে নফস বা ব্যক্তিসত্তা, সৃষ্টি এবং উপকরণ শরীক নেই- তা প্রকৃতপক্ষে একটি কুরবানী এবং পরিপূর্ণ কুরবানী প্রকৃতপক্ষে পরিপূর্ণ ইবাদত। এরপর বলা হয়েছে যে, আমার জীবনও আল্লাহ্‌রজন্য এবং আমার মরণও আল্লাহ্‌র জন্য। এই শেষ বাক্যটি 'কুরবানী' শব্দের ব্যাখ্যা, যেন কেউ এই সংশয়ে না পড়ে যে, কুরবানী বলতে এখানে ছাগল, গরু বা উটের কুরবানী বোঝানো হয়েছে। বরং 'আমার জীবন এবং আমার মরণ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য'- এই কথাটি দ্বারা যেন স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, এই কুরবানী দ্বারা আত্মার কুরবানী বোঝানো হয়েছে। আর কুরবানী শব্দটি 'কুরব' (তথা নৈকট্য) থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এটি এই বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিতবাহী যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য তখনই লাভ হয় যখন সমস্ত আত্মিক শক্তি এবং প্রবৃত্তির তাড়নার ওপর মৃত্যু এসে যায়।বস্তুত এই আয়াতটি মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ নৈকট্যের এক সুমহান দলিল। আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর এক পরম ও পূর্ণাঙ্গ নৈকট্য রয়েছে। আর এই আয়াতটি বলে দিচ্ছে, মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র সত্তায় এতটাই বিলীন ও নিমগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তাঁর জীবনের প্রতিটি নিশ্বাস এবং তাঁর মৃত্যু কেবল আল্লাহ্‌র জন্যই হয়ে গিয়েছিল। আর তাঁর অস্তিত্বে নফস, সৃষ্টি এবং পার্থিব উপায়-উপকরণের কোনো অংশ অবশিষ্ট ছিল না; আর তাঁর রূহ আল্লাহ্‌র দরবারে এমন একনিষ্ঠভাবে লুটিয়ে পড়েছিল যে, তাতে অন্য কিছুর বিন্দুমাত্র সংমিশ্রণ ছিল না।"

(আসমতে আম্বিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৮, পৃ: ৬৬৪-৬৬৬)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অন্যত্র বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যদিও কিছু বিষয় বৈধ করেছেন, কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, সারা জীবন তাতেই ব্যয় করে দিতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তো তাঁর বান্দাদের গুণাবলি সম্পর্কে বলেন: يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا - (সূরা আলফুরকান: ৬৫) অর্থাৎ, আর সেসব লোক যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সিজদাবনত অবস্থায় ও দাঁড়িয়ে রাত অতিবাহিত করে। অর্থাৎ তারা তাদের প্রতিপালকের জন্য সারা রাত সিজদায় ও দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দেয়। এখন দেখো, যে ব্যক্তি রাত-দিন স্ত্রীদের মাঝে ডুবে থাকে, সে আল্লাহ্‌র অভিপ্রায় অনুযায়ী রাত কীভাবে ইবাদতে কাটাতে পারে? এরূপ ব্যক্তিরা যেন স্ত্রীদেরকে আল্লাহ্‌র বিপরীতে শরীকস্বরূপ দাঁড় করায়। মহানবী (সা.)-এর নয়জন স্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি সারা রাত আল্লাহ্‌র ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। এক রাতে তাঁর পালা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-র নিকট ছিল। রাতের কিছু

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 19-26 Feb 2026 Issue No.8-9

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত আয়েশার চোখ খুলে যায়। তিনি দেখলেন, মহানবী (সা.) নেই। তাঁর মনে সন্দেহ জাগল, হয়ত তিনি (সা.) অন্য কোনো স্ত্রীর ঘরে গিয়েছেন। তিনি উঠে প্রতিটি ঘরে সন্ধান করেন, কিন্তু তাঁকে (সা.) পান নি। পরিশেষে দেখলেন, তিনি(সা.) কবরস্থানে রয়েছেন এবং সিজদায় ক্রন্দন করছেন। এখন দেখো, তিনি (সা.) জীবিত ও প্রিয়তমা স্ত্রীকে ছেড়ে মৃতদের স্থান কবরস্থানে গেলেন এবং কাঁদতে থাকলেন। তাহলেকি এটা বলা সম্ভব যে, তাঁর (সা.) ক্ষেত্রে স্ত্রীগণ কামনা চরিতার্থের বা প্রবৃত্তির বাসনা অনুসরণের জন্য ছিলেন, যেমনটি কি না আপত্তিকারীরা তাঁর (সা.) সম্পর্কে আপত্তি করে থাকে? মোটকথা, ভালোভাবে মনে রেখো, আল্লাহ্‌র আসল উদ্দেশ্য হলো তোমাদের ওপর যেন কুপ্রবৃত্তি প্রবল না হয়। আর তাকওয়ার পূর্ণতার জন্য যদি প্র কৃত প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করো।"

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৬)

তিনি (আ.) জামা'তের সদস্যদের প্র তিও এই সাধারণ নসীহত করেছেন যে, তাকওয়ার নিরিখে যদি বিয়ে করতে হয় তবে করো, কিন্তু এটি যেন ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও কুপ্রবৃত্তির খাতিরে না হয় যে, বিয়ে করা হবে বা অধিক স্ত্রী গ্রহণ করা হবে। আজকাল এ বিষয়ে অনেক অভিযোগও আসে। ইসলাম এর অনুমতি দেয় না। প্রয়োজন বৈধ হওয়া উচিত। ইসলামে যারা অবৈধভাবে বিয়ে করে, মূলত তাদের কারণেই ইসলামের ওপর আপত্তি করা হয় যে, ইসলামে (একাধিক) বিয়ের অনুমতি রয়েছে। কিন্তু মুসলমানদেরও মনে রাখা উচিত এবং যারা আপত্তি করে তাদেরও জানা থাকা উচিত, এর জন্যও কিছু শর্ত রয়েছে এবং সেগুলো পূরণ করা অপরিহার্য।

একটি রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, ইতিপূর্বেও এই হাদীসটি খুতবায় বর্ণনা করেছি; মহানবী (সা.) বলেছেন যে, জাগতিক জিনিসগুলোর মধ্য থেকে স্ত্রী ও সুগন্ধি আমার কাছে প্রিয়, কিন্তু সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটি আমার প্রিয় এবং আমার চোখ জুড়ানোর কারণ– তা হলো নামায।

(সুনান নিসাঈ, কিতাব আশরাতুন নিসা, হাদীস-৩৩৯১)

হযরত মু সলেহ্ মওউদ (রা.)-র পক্ষ থেকে এর একটি বিস্তারিত ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে, যা আমি পুনরায় এই কারণে এখানে উপস্থাপন করছি। তিনি (রা.) এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন: ***"কুররাতি আঈনি ফিস সলাত"*** অর্থাৎ, নামাযে আমার চোখের স্নিগ্ধতা রাখা হয়েছে। এটিও একটি বিশেষ স্বাতন্ত্র্য যা অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলাম লাভ করেছে।

পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি নেই যাদের মাঝে নামাযের মতো ইবাদতে এমন নিয়মবদ্ধতা রাখা হয়েছে। পূর্ববর্তী সকল ধর্ম হয় বাহ্যিক অঙ্গসঞ্চালনার ওপর জোর দিয়েছে, অথবা তাদের মাঝে ইবাদতের সময়গুলোর ব্যবধান এত দীর্ঘ রাখা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিকতা দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু একমাত্র ইসলামই এমন একটি ধর্ম যার অনুসারীদের দিনে পাঁচবার ইবাদতের জন্য আহ্বান করা হয়। অন্য কোনো ধর্ম এমনটি নয়। এখন মানুষজনের এটা ভাবা উচিত, যখন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করা হয়েছে, তখন সেগুলো আদায় করাও জরুরি যেন আধ্যাত্মিকতা বজায় থাকে; কেবল দুনিয়াদারিতেই মগ্ন থাকবে না। তিনি লিখেছেন, খ্রিষ্টান ও হিন্দুরা সপ্তাহে একবার ইবাদতের জন্য যায়; হতে পারে, তাদের কেউ কেউ রাত-দিন ইবাদত করে, কিন্তু এখানে জামা'তবদ্ধ বা সমষ্টিগত ইবাদতের কথা বলা হচ্ছে। একদিনে কয়েকবার ইবাদত করার নির্দেশ রসূলে করীম (সা.)-ই দিয়েছেন। এছাড়া সালাতের একটি অর্থ দোয়াও হয়ে থাকে। আর এভাবে মহানবী (সা.) দোয়ার প্রতি জোর দিয়েছেন। অন্যান্য ধর্মের ইবাদতগুলোতে বাহ্যিক বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলোর মাধ্যমে ইবাদতে স্বাদ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন আর্যসমাজী ও খ্রিষ্টানদের মাঝে নাচগান বা বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হয়। কিন্তু রসূলে করীম (সা.) বলেন, আমাকে এমন ইবাদত দান করা হয়েছে যার মধ্যেই স্বাদ রয়েছে এবং এমন স্বাদ রয়েছে যার মোকাবিলা কোনো ধর্ম করতে পারে না।"

[সীরাতুন নবী (সা.), প্রণেতা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.), ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬৩)

সুতরাং গানবাজনা নয়, বরং নীরবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত, তাঁর প্রশংসা (তাহমীদ) ও পবিত্রতা বর্ণনা (তাকদীস) করা আর আল্লাহ্ তা'লার গুণগান করা এবং কান্নাকাটি বা আহাজারি করা– এই বিষয়গুলো নিজগুণেই এরূপ আর এমন ইবাদত যার মাঝে তৃপ্তি বিদ্যমান এবং এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসাও বৃদ্ধি পায়। অতএব, আমাদের তাঁর (সা.) আদর্শ অনুসরণে নামায ও ইবাদতের এই মান অর্জনের চেষ্টা করা উচিত; তবেই আমরা প্রকৃত অর্থে মুসলমান হিসেবে গণ্য হতে পারব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.)-কে একটি পত্র লিখতে গিয়ে তাতে লিখেছেন,

আপনি আপনার ব্যবহারিক কর্মপন্থার জন্য যা জিজ্ঞাসা করেছেন তা হলো, রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণের প্রতি আগ্রহ ও অনুরাগ সৃষ্টি করুন। রসুলু ল্লাহ্ (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করুন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) যে-সব আমলের প্রতি অত্যন্ত গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন তা হলো দুটি– একটি হলো নামায এবং অন্যটি জিহাদ। নামায প্র সঙ্গে মহানবী (সা.) বলেন: ***'কুররাতি আঈনি ফিস সালাত'।*** অর্থাৎ আমার চোখের স্নিগ্ধতা নামাযে রাখা হয়েছে। আর জিহাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন, আমি আকাঙ্ক্ষা করি, আমি যেন আল্লাহ্‌র পথে নিহত হই এবং পুনরায় জীবিত হই, এরপর পুনরায় নিহত হই ও পুনরায় জীবিত হই এবং পুনরায় নিহত হই।

এটি বর্ণনা করার পর তিনি (আ.) বলেন, সুতরাং এ যুগে জিহাদ আধ্যাত্মিক রূপ ধারণ করেছে এবং এই প্রকারের জিহাদ হলো ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা, বিরোধীদের অভিযোগের জবাব দেওয়া, সত্য-সুদৃঢ় ধর্ম ইসলামের সৌন্দর্য পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতা বিশ্বের কাছে প্রকাশ করা। এটাই জিহাদ, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে অন্য কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন।" (হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেবের নামে পত্র, মকতুবাতে আহমদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯)

অতএব, আমাদের কলম এবং তবলীগের জিহাদেও তখনই বরকত হবে যখন আমরা আমাদের ইবাদতের মান এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসাকে বৃদ্ধি করব। আমরা যদি এই জিহাদে অংশ নিতে চাই, তবে আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও দোয়ার প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হবে এবং আমাদের ইবাদতসমূহের প্রতিও আমাদের মনোযোগী হতে হবে। আর আমরা যদি তাঁর (সা.) আদর্শ অনুসরণ করে এমনটি করি, তবেই আমাদের কাজে বরকত সৃষ্টি হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

আজ বাংলাদেশ জামা'তের জলসাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেখানে যথেষ্ট বিরোধিতাও হয়ে থাকে। তাদের জন্য দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের সবাইকে স্বীয় সুরক্ষার বেষ্টনীতে রাখেন এবং তাদের জলসাও যেন সফলভাবে ও নিরাপদে সমাপ্ত হয়। (আমীন)।

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০২৬)

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)-এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

اَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ اَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir